গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৪ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ২ - ৮ মার্চ, ২০১২ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

মহান স্ট্যালিন স্মরণে

২১ ডিসেম্বর, ১৮৭৯ — ৫ মার্চ, ১৯৫৩

একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, সংশোধনবাদী এবং মধ্যপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লেনিন রাষ্ট্র এবং সর্বহারা একনায়কত্ব সংক্রান্ত মার্কসবাদী তত্ত্বকে বিকৃতি ও বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছেন; সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাগুলি থেকে সাধারণ সত্যগুলিকে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে অমূল্য অবদান রেখে গিয়েছেন। তেমনই স্ট্যালিনও ট্রটস্কিবাদী ও

পাঁচের পাতায় দেখুন

৯ দফা দাবিতে

১৪ মার্চ জনজোয়ারে ভাসবে দিল্লির রাজপথ

জনতার দাবি চিকিৎসার

দেশের শতকরা ৯০ জন গরিব-নিম্নবিত্ত-সাধারণ মানুষের ভারত অপুষ্টির শিকার হয়ে রোগ-ব্যাধিতে ধুঁকছে, চিকিৎসা করাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে, চিকিৎসা করাতে না পেরে অকালে মরছে। সরকারি হাসপাতালই এদের ভরসা — যেখানে চিকিৎসার নামে চলে চরম দুর্নীতি, চুরি, অব্যবস্থা, প্রহসন। সেখানে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ওষুধ সরকার ক্রমাগত কমিয়ে চলেছে। ওষুধপত্র তো বটেই, বহুক্ষেত্রে রোগীকে তুলোটাও কিনে আনতে হয় বাজার থেকে। এদিকে ওষুধের দামও বাড়ছে লাফিয়ে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্র এখানে প্রায়শঃই অকেজো থাকে বা পরীক্ষার ডেট বিলম্বিত করা হয়। রোগীকে বাধ্য হয়ে ব্যয়বহুল বেসরকারি ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে ছুটতে হয়। দু-বেলা ভাতের সংস্থান করতে না পারলেও বহুমূল্য ওষুধ ও যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার বন্দোবস্ত করতে মহাজনের কাছে ঘটি-বাটি-ভিটে বন্ধক বা বিক্রি হয়ে যায়। এই মর্মান্তিক পরিস্থিতি সরকারি নীতির জন্যই। এই অবস্থায়ও সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি আরও বেশি বেশি করে বেসরকারি মালিকদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে। বেসরকারি মালিকদের মুনাফা লোটার সুযোগ করে দিচ্ছে। স্বাস্থ্যকে পরিণত করা হয়েছে উচ্চ মুনাফার ব্যবসায়। পরিস্থিতি এমনই যে, চিকিৎসার ব্যয়ভার দেশের মধ্যবিত্ত মানুষজনেরও আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

অন্যদিকে, আর এক ভারত। তার বাসিন্দা অর্থবান, কোটিপতি ব্যবসাদার, পুঁজির মালিক, সরকারি মন্ত্রী-আমলা-অফিসার। পুষ্টিকর খাদ্যে এদের ঘর ভরা। উপচে পড়ছে প্রাচুর্য। অসুস্থ হলে ব্যয়বহুল বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে চিকিৎসার খরচ তো এঁদের হাতের ময়লা।

এই সংখ্যালঘু অর্থবানদের সচ্ছল ভারত নিয়ে মশগুল কেন্দ্র ও রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন সরকারগুলো। এই ভারতকে নিয়েই পূর্বতন কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের 'ফিল গুড' এবং কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের 'সাইনিং ইন্ডিয়া'র প্রচার। এই ভারতকে কী করে আরও সচ্ছল করে তোলা যায় — তাই-ই সরকারগুলির ধ্যান-জ্ঞান। তাহলে, ৯০ শতাংশের যে ভারত — তার পুষ্টি ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে কে? কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার এই ভারত সরকারি অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরবে? সরকার কেন এদের পুষ্টি ও চিকিৎসার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবে না?

এই প্রশ্নের জবাব চাইতে আগামী ১৪ মার্চ দিল্লির রাজপথে লক্ষ মানুষের প্রতিবাদী মিছিলে সামিল হতে চলেছেন দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা গরিব নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে এই প্রতিবাদী মিছিলের সঙ্গে থাকছে দেশের কোটি কোটি মানুষের প্রতিবাদী স্বাক্ষর সংবলিত

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রতিশ্রুতি ছিল, প্রতিহিংসার রাজনীতিকে বিদায় দেওয়া হবে

২২ ফেব্রুয়ারি বর্ধমানের দেওয়ানদিঘিতে সিপিএম দলের প্রাক্তন বিধায়ক প্রদীপ তা ও অপর একজন নেতা কমল গায়েনের নৃশংস হত্যা সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে। গত নির্বাচনে সিপিএমের পরাজয়ে যাঁরা আশা করেছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেস তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজনৈতিক প্রতিহিংসার পথ নেবে না, খুনোখুনির পরিবেশের অবসান ঘটাবে, বর্ধমানের হত্যাকাণ্ড তাঁদের নিদারুণ হতাশ করেছে।

দিনের আলোয় বহু মানুষের চোখের সামনে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়, খুনিদের চিনতে অসুবিধা হয়নি। ধৃতরাও নাকি পুলিশের কাছে দেওয়া জবানবন্দিতে খুন করার কথা স্বীকার করেছে। ঐ দুষ্কৃতীরা কারা, কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত, খুনের কারণ কী, ইত্যাদি প্রশ্নে তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল পরস্পরবিরোধী। সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেল, খুন করার অভিযোগে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা একদা সিপিএমেরই ছিল এবং নিহত সিপিএম নেতার সঙ্গে তাদের শত্রুতাও ছিল। সরকার বদলের পর এরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। তৃণমূল মন্ত্রী ও নেতারা এমন ঢঙে বিবৃতি দিলেন, যাতে মনে হল তাঁরা বুঝি দুষ্কৃতীদের নিজ দলের বলে স্বীকৃতি দেবেন না। কিন্তু আদালতে ধৃতদের হাজিরার দিন তৃণমূল নেতাদের ভূমিকায় স্পষ্ট ধরা পড়ল যে ধৃতদের তাঁরা 'দলের সম্পদ' বলেই মনে করছেন। ফলে এই হত্যাকে সিপিএম দুষ্কৃতীদের কাজ বলে তৃণমূল নিজেদের আড়াল করতে পারে না।

দুষ্কৃতীরা তাদের কুকর্ম নিরাপদে চালিয়ে যাওয়ার জন্য সবসময় শাসকদলের ছত্রছায়াতেই থাকতে চায়। এখন তৃণমূল ক্ষমতায় থাকায় দুষ্কৃতীরা তৃণমূলের ছাতার তলায় আসতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তৃণমূল যদি এই দাগিদের এ ভাবে গ্রহণ না করত তবে পরিস্থিতি অন্যরকম হলেও হতে পারত। তৃণমূল শুধু তাদের কাছেই টেনে নেয়নি, অনেককে এমনকী স্তরে স্তরে নেতৃত্বের পদেও বসিয়েছে। জনসাধারণ এটা চায়নি। তৃণমূল দলের সৎ কর্মী-সমর্থকরাও এটা চাইতে পারে না। কিন্তু দল তো চালান তাঁদের নেতারা!

চারের পাতায় দেখুন

বর্ধমান ঃ খুনিদের কঠোর শাস্তির দাবি করল এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ২৩ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, সিপিএম-এর দীর্ঘদিনের শাসনকাল বহু রাজনৈতিক খুনের রক্তাক্ত অধ্যায়ে কলঙ্কিত হয়ে আছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেস এর পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় বসেছিল। বর্ধমানে সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক ও অন্য আর এক নেতার হত্যা উদ্বেগজনকভাবে দেখাল, পুনরায় পাল্টা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে। এটাও উদ্বেগজনক যে, প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধান না করে আত্মপক্ষ সমর্থনে যেকোনও কারণ দর্শাবার ঝোঁকের পুনরাবৃত্তি সরকারি মন্ত্রীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, যা কার্যত দোষীদেরই আড়াল করে।

আমরা এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং খুনিদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

দেশজোড়া সফল সাধারণ ধর্মঘট

শ্রমজীবী মানুষকে অভিনন্দন জানাল এ আই ইউ টি ইউ সি

ধর্মঘটের প্রচারে কলকাতার রাজপথে এ আই ইউ টি ইউ সি-র মিছিল

২৮ ফেব্রুয়ারি এ আই ইউ টি ইউ সি সহ ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাঁটাই বন্ধ ও শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগ সহ ১০ দফা দাবিতে দেশজুড়ে সাধারণ মানুষ ও শ্রমিক-কর্মচারীরা বিপুল সংখ্যায় ধর্মঘটে অংশ নিয়েছেন। বিশেষত, স্টিল, কোলিয়ারি, বন্দর, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যাঙ্ক, বিমা ইত্যাদি সংগঠিত ক্ষেত্র এবং বিড়ি, ইটভাটা, নির্মাণ শিল্প সহ সমস্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রে ধর্মঘটে বিপুল সাড়া মিলেছে। পশ্চিমবঙ্গেও ব্যাপক অংশের শ্রমিক-কর্মচারীরা ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন। তারাতলা-গার্ডেনরিচ, দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চল ও কোলিয়ারিতে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া ধর্মঘট ছিল সর্বাত্মক। হুগলি নদীর দু'পারের জুটমিলগুলি সম্পূর্ণ স্তব্ধ ছিল। সরকার জোর করে বাস-ট্রাম-ট্রেন চালালেও তাতে মানুষ ওঠেনি। জনসাধারণকে এই সর্বাত্মক ধর্মঘটের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, গোটা দেশের মানুষ এই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত অবিলম্বে দাবিগুলি মেনে নেওয়া। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধর্মঘট ভাঙার জন্য যেভাবে ভয়ভীতি, হুমকি ও প্রলোভনের পথ নিয়েছিল, কমরেড শঙ্কর সাহা তার তীব্র নিন্দা করেন। সারা দেশের মেহনতি মানুষের সাথে এ রাজ্যের সবচেয়ে দরিদ্র শ্রমজীবী অংশও ধর্মঘটে সর্বতোভাবে সামিল হয়েছেন, অথচ কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতারা সহ

সাতের পাতায় দেখুন

পার্ক স্ট্রিট ঘটনায় বুদ্ধিজীবী মঞ্চের প্রতিবাদ

শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি অধ্যাপক তরুণ স্যানাল ২১ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেছেন —

পার্ক স্ট্রিটে এক মহিলার ধর্ষিতা হওয়ার ঘটনাকে তদন্তের আগেই বর্তমান পুলিশ প্রধান যেভাবে 'সাজানো ঘটনা' বলে ধামাচাপা দেওয়ার অপচেষ্টা করেছেন, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। পূর্বতন সরকারের আমলে রিজওয়ানুর রহমানের রহস্যজনক মৃত্যুকে তৎকালীন পুলিশ কমিশনার তদন্ত এড়িয়ে এভাবেই ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলে, আমরা তাকে ধিক্কার জানাই ও পদত্যাগ দাবি করি। পূর্বতন সরকার ঐ পুলিশ প্রধানকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। একইভাবে পার্ক স্ট্রিটের ঘটনায় বর্তমান পুলিশ কমিশনারের ভূমিকার জন্য আমরা তার পদত্যাগ দাবি করছি।

একই সাথে আমরা মনে করি, মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যও অসমীচীন ও অবিবেচনাপ্রসূত। এ ধরনের মন্তব্য করা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরত থাকাই কাম্য।

উল্লেখ্য যে, ২০ ফেব্রুয়ারি কলেজ স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী মঞ্চের ভাষা শহিদ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানেও অধ্যাপক তরুণ সান্যাল তাঁর ভাষণে এই দাবি উত্থাপন করেন।

বোরো চাষিদের লাইন না কাটার প্রতিশ্রুতি দিলেন বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান

২৪ ফেব্রুয়ারি অ্যাবেকার রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান প্রসাদ রঞ্জন রায়কে ১১ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে গত দেড় মাসে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিতে অস্বাভাবিকভাবে দেড় মাসে তিনবার মাশুলবৃদ্ধির তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, সমস্ত রীতিনীতি লঙ্ঘন করে বণ্টন কোম্পানি বোরো চাষের সময় কৃষকদের লাইন কেটে দিচ্ছে। ব্যাপক লোডশেডিং-এর ফলেও বোরো চাষের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।

অবিলম্বে সমস্ত লাইন জুড়ে দিয়ে, পোড়া ট্রান্সফরমার পাল্টে লোডশেডিং বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন অ্যাবেকা নেতৃবৃন্দ। বোরো চাষের ক্ষতি হলে রাজ্যে খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে এবং কৃষকদের আত্মহত্যার মিছিল শুরু হতে পারে বলে তাঁরা মনে করেন। কমিশনের চেয়ারম্যান বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়ে বলেন, বকেয়া টাকার কিস্তি বাড়িয়ে দেওয়া হবে। বোরো চাষিদের লাইন কাটা হবে না এবং কাটা লাইন জুড়ে দিয়ে লোডশেডিং বন্ধ করা হবে।

অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী এবং অনুকূল ভদ্র, কুণাল বিশ্বাস, সুভাষ ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কয়লা এবং কোম্পানির লোকসান সংক্রান্ত সঠিক তথ্য প্রকাশের উপর জোর দিয়ে বলেন, সঠিকভাবে এগুলি প্রকাশ না করলে কমিশনের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

বরানগরে নারী নিগ্রহ ও মৃত্যুর প্রতিবাদে মহিলা বিক্ষোভ

বরানগর থানা এলাকায় ঝুপড়িবাসী মহিলাকে ধর্ষণ এবং তাঁর মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে ২৩ ফেব্রুয়ারি সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বরানগর থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেডস সুজাতা সেন ও অতসী মুখার্জী। পরে সংগঠনের কলকাতা জেলা সভানেত্রী কমরেড ভারতী রায়ের নেতৃত্বে পাঁচ জনের একটি প্রতিনিধি দল থানা কর্তৃপক্ষের কাছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেয়। থানা কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।

পশ্চিমবঙ্গ ধারাবাহিক জনশিক্ষা কর্মী সমিতির দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন

১৮ ফেব্রুয়ারি বারুইপুর রবীন্দ্রভবনে পশ্চিমবঙ্গ ধারাবাহিক জনশিক্ষা কর্মী সমিতির দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শ্যামল মণ্ডল, বিধায়ক নির্মল

বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক তরুণ নস্কর

মণ্ডল, বিধায়ক নমিতা সাহা প্রমুখ। উদ্বোধনী ভাষণে কমরেড নস্কর বলেন, আপনাদের সংগঠনের নাম যাই হোক না কেন, আপনারা তো আসলে শিক্ষক। আপনাদের দেওয়া হয় বিভিন্ন স্তরে মাত্র ১২০০/৭০০/৫০০ টাকা করে মাসিক সাম্মানিক! তাও ৪০ মাস বকেয়া। ভাবতেও লজ্জা করে। শুনলাম কেন্দ্রীয় সরকার তার এই প্রকল্প বন্ধ করে দিয়েছে। আর সেই কারণে বিগত রাজ্য সরকারও তা বন্ধ করেছে। কিন্তু আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দেশ, এই রাজ্য যত পিছিয়েছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের যা স্বল্পতা তাতে এই জনশিক্ষা কর্মীদের প্রাথমিক শিক্ষার কাজে লাগানো যেত। আপনাদের যে দাবি — 'সকল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীকে স্থায়ীকরণ করতে হবে' বা 'বকেয়া সাম্মানিক অবিলম্বে প্রদান করতে হবে' — এগুলি কোনও অযৌক্তিক দাবি নয়। আমি ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে দাবি করেছি যে, আগামী বাজেটে যেন আপনাদের এই দাবিগুলি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাজ্য সরকার রাখে। যদি না রাখে তাহলে বাজেট অধিবেশনে আরও জোরদার দাবি তোলা হবে। মন্ত্রী শ্যামল মণ্ডল এবং অন্য বিধায়করা উপস্থিত আছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলি খেয়াল রাখবেন।

সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ৩৫০ জন মহিলা ও পুরুষ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে ৬১ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি হিসাবে মহঃ হজরত আলি এবং যুগ্মসম্পাদক হিসাবে কৌশিক কুমার সাহা ও মহঃ আশরাফ আলি নির্বাচিত হন।

ধর্মঘট বিরোধী সার্কুলারের প্রতিবাদ জানাল এ আই ইউ টি ইউ সি

২৮ ফেব্রুয়ারি সারা ভারত ধর্মঘটে সরকারি কর্মচারীদের অংশগ্রহণের উপর সরকারের নিষেধাজ্ঞা জারির তীব্র নিন্দা করে এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ২২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

''আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে রাজ্যের চিফ সেক্রেটারির ২১ ফেব্রুয়ারি জারি করা আদেশনামা নং ২৮৩(৬০)-পি এস লক্ষ করলাম। উক্ত আদেশনামা বলে সরকারি কর্মচারীদের ছুটি নেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে, ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার আছে। এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার পদক্ষেপ চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক। সিপিএম সরকার গত ৩৪ বছর ক্ষমতায় থেকেও সরকারি কর্মচারীদের জন্য ধর্মঘটের অধিকার সহ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও রাজনৈতিক অধিকার দিয়ে বিধানসভায় কোনও আইন তৈরি করেনি। এর বিরুদ্ধে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন, একইভাবে কর্মচারীদের বঞ্চনা করার কোনও অধিকার তাঁদেরও জন্মায় না। আমরা সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা না করে পারছি না। একই সাথে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে এই অগণতান্ত্রিক আদেশনামা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

শ্রমজীবী জনগণের ন্যায্য দাবিগুলির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের প্রতি সরকারের এই অগণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে ২৮ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটকে সর্বাত্মকভাবে সফল করার প্রস্তুতি নিতে আমাদের সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে সরকারি কর্মচারী সহ সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের আহ্বান জানাচ্ছি।'

পরিচারিকাদের আন্দোলনের জয়

অসংগঠিত শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কোনও কোনও পেশার ক্ষেত্রে প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করার ঘোষণা করেছিল। কিন্তু এই তালিকায় গৃহ পরিচারিকাদের পেশা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাঁরা স্বাস্থ্যবীমার আওতাভুক্তও ছিলেন না। সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি হতদরিদ্র পরিচারিকাদের স্বার্থে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও স্বাস্থ্যবীমার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন পরিচালনা করে। আন্দোলনের চাপে প্রভিডেন্ট ফান্ডের দাবি তাঁরা আগেই অর্জন করেছিলেন। সম্প্রতি স্বাস্থ্যবীমার দাবিও তাঁরা আদায় করেছেন।

নিয়মানুযায়ী, সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার খরচ, হাসপাতালে অথবা বাইরে থেকে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচের রসিদ জমা দিলে তাঁরা সেই খরচ সরকারের কাছ থেকে পাবেন। সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় সমিতির সদস্যরা চিকিৎসার পর সেই খরচ পেতে শুরু করেছেন বলে জানালেন সমিতির জেলা সম্পাদিকা পুষ্প পাল।

উচ্ছেদের প্রতিবাদে মঙ্গলাহাটের হকারদের সমাবেশ

উচ্ছেদের প্রতিবাদে এবং হকারদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ১৫ ফেব্রুয়ারি হাওড়া মঙ্গলাহাট হকার ইউনিয়নের সদস্যরা রানি রাসমণি রোডে অবস্থান এবং ডেপুটেশনে সামিল হন। ঐদিন বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী মঙ্গলাহাটের সহস্রাধিক হকার বেলা ১২টা থেকে অবস্থান শুরু করেন। তাঁদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন কলকাতার ভ্রাম্যমান হকাররাও। তাঁরাও তাঁদের হকারি করার অধিকার হারিয়েছেন। ঐদিন অবস্থান মঞ্চের প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের সভাপতি হাওড়া জেলার বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড অলোক ঘোষ এবং মঙ্গলাহাট হকার ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

গত ১৮ অক্টোবর বিনা নোটিশে এই হকারদের উচ্ছেদ করা হয়। এর প্রতিবাদ জানানোর অপরাধে সভাপতি, সম্পাদক সহ ৪ জনের নামে জামিন অযোগ্য ধারায় মিথ্যা মামলা করা হয়। ১৯ জন হকারকে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়।

উচ্ছেদের দিনই হকাররা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেসময় ৭ দিনের মধ্যে হকারদের সাথে বসে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। ৪ মাস কেটে গেলেও কোনও সমাধান হয়নি। ইতিমধ্যে হকার শ্যামল সাহা ঋণের চাপে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন, আত্মহত্যা করেছেন হাওড়ার এক জন হকার। অনাহারে রয়েছেন হকার ও তাদের পরিবারের সদস্য মিলে ২০ হাজার মানুষ। এ ছাড়াও বিপন্ন প্রায় লক্ষাধিক পরিবার যারা মঙ্গলাহাটের সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত।

এর আগে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পৌরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সাথে দেখা করে সমাধানের প্রস্তাব রাখলে তিনি তাদের প্রস্তাব লিখিতভাবে মুখ্যমন্ত্রী, হাওড়ার পুলিশ কমিশনার এবং তাঁকে দেওয়ার কথা বলেন। তাঁর কথা মতো ৪৫ দিন আগে ইউনিয়ন সবাইকে লিখিতভাবে জানালেও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করায়, ইউনিয়নের সম্পাদক শান্তি ঘোষের নেতৃত্বে জয়ন্ত চৌধুরী সহ ৫ জন প্রতিনিধি ডেপুটেশনে যান। কিন্তু দুঃখের কথা, মন্ত্রী ১৫ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টায় সময় দিয়েও নিজে দেখা করেননি। তাঁর দপ্তরের এক অফিসার স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এবং মন্ত্রীকে জানাবেন এই আশ্বাস দেন।

কেরালায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নাট্যদল। দলটি গত এক মাস ধরে রাজ্য জুড়ে পথনাটিকার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্রে স্বাক্ষর দানে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং পার্লামেন্ট অভিযানের প্রচার চালিয়েছে। ছবিতে ২৫ ফেব্রুয়ারি ত্রিবান্দ্রমে জনসভার আগে পথনাটিকা।

১৪ মার্চের প্রচার ঃ দিল্লির বুকে ব্যাপক সাড়া

১৪ মার্চ, গোটা দেশের মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের দাবি নিয়ে পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভ মিছিল তুলে ধরবে এ দেশের খেটে খাওয়া মানুষের কথা। তারই প্রস্তুতিতে চলছে সারা দেশজুড়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান। তা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। রাজ্যে রাজ্যে

দিল্লির রাজপথ

এই স্বাক্ষর সংগ্রহের কর্মসূচিতে অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছেন সাধারণ মানুষ। ইতিমধ্যেই কয়েক কোটি স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়েছে। আরও যে কয়েকটি দিন বাকি তাতে আরও বহু মানুষ দাবিপত্রে স্বাক্ষর করবেন। দলীয় কর্মী-সমর্থক ছাড়াও বহু সাধারণ মানুষ নাম লেখাচ্ছেন ১৪ মার্চ এই লক্ষাধিক মানুষের মিছিলে অংশগ্রহণ করতে চেয়ে।

দিল্লির বুকেও চলছে প্রস্তুতির কাজ। বিভিন্ন রাজ্য থেকে এত বেশি লোকের একদিনে দিল্লি পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই ১৪ মার্চের দু-এক দিন আগে থেকেই নানা রাজ্য থেকে প্রচুর মানুষ দিল্লিতে পৌঁছে যাবেন। তাঁদের অনেকেই আসবেন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে। দিল্লি এবং তার নিকটবর্তী রাজ্যগুলি থেকে আরও কয়েক হাজার মানুষ আসবেন ঐদিন সকালে। বেলা ১১টায় রামলীলা ময়দান থেকে শুরু হবে সংসদ অভিমুখে সুশৃঙ্খল সুবিশাল মিছিল।

একদিকে দীর্ঘ যাত্রার পরে হাজার হাজার মানুষের যতদূর সম্ভব বিশ্রাম,খাবারের ব্যবস্থা করা, অন্যদিকে সুবিশাল মিছিলের নিখুঁত প্রস্তুতির জন্য দিনরাত কাজ করে চলেছেন দিল্লি রাজ্যের এস ইউ সি আই (সি) নেতা-কর্মীরা। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অন্যান্য রাজ্যের কিছু স্বেচ্ছাসেবক। চলছে প্রচারাভিযান, অর্থসংগ্রহ। প্রস্তুতির খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থাপনাকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্য চলছে শেষ পর্যায়ের কাজ।

সৌন্দর্যায়নের নামে দিল্লি প্রশাসন দেওয়াল লিখন, পোস্টার ইত্যাদি জনগণের দাবি ব্যক্ত করার স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কিন্তু এভাবে কি মানুষের ভাষা চেপে দেওয়া যায়? মুখে মুখেই অন্য রাজ্যের মতো প্রচার চলছে দিল্লিতেও। নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও এখানে ওখানে যে ক'টি দেওয়াল লিখন সম্ভব হয়েছে তা মানুষের দৃষ্টি এড়ায়নি। স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে গোটা দিল্লি এবং আশপাশের এলাকা জুড়ে।

দিল্লির মানুষ বহু আন্দোলন দেখেছেন। বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে তাদের একদা পরিচয় ঘটেছিল সিপিএম, সিপিআই-এর মাধ্যমে। গোটা দেশেই অধুনা এই দলগুলির কাজকর্ম দেখে মানুষ হতাশ। বামপন্থী রাজনীতি বলতে মানুষ বোঝে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আন্দোলন। আজ কোথাও এই ভূমিকায় সিপিএম নেই। পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যে তো বটেই, দিল্লির বুকেই আন্দোলন গড়ে তুলছে এস ইউ সি আই (সি)। দিল্লি শহরে পানীয় জলের দাবিতে এস ইউ সি আই (সি)-র আন্দোলন মানুষ দেখেছে। তাই বামপন্থী দল হিসাবে এস ইউ সি আই (সি)-র ভূমিকা তাদের ভরসা জোগাচ্ছে। যেমন শোনা গেল একজন স্বেচ্ছাসেবকের অভিজ্ঞতায় — এক প্রাইভেট সিকিউরিটি কর্মীকে দাবিপত্রে স্বাক্ষর করতে বলায় তিনি বলেন, 'আমরা ছোটবেলায় লাল ঝান্ডা পার্টি বলে জানতাম সিপিএম-সিপিআইকে। আমরা হতাশ হয়ে গিয়েছি ওদের ওপর। ওরা কংগ্রেস, বিজেপির থেকে আলাদা কিছু নয়। আপনারা লাল ঝান্ডা নিয়ে আন্দোলন-লড়াই করছেন। আপনাদের দেখে ভালো লাগছে।

দিল্লি সহ সারা দেশের মানুষ আন্না হাজারের আন্দোলনকে ঘিরে স্বপ্ন দেখেছিলেন, ভেবেছিলেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন হবে। হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিলেন তাঁর পাশে। কিন্তু আন্না হাজারে মাঝপথে আন্দোলন তুলে নেওয়ায় দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের শোচনীয় পরিণতি দেখে তাঁরা হতাশ। তাঁদের প্রশ্ন, এতবড় আন্দোলন যখন ব্যর্থ হয়ে গেল আপনারা কি পারবেন? স্বেচ্ছাসেবকরা উত্তর দিতে যাওয়ার আগেই বহু জায়গায় সাধারণ মানুষ তার উত্তর দিচ্ছেন তাঁদের নিজেদের মতো করে। যেমন দিল্লির এক বাজার এলাকায় স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে সই করতে করতে

জামসেদপুর

পাশ থেকে চলে যাওয়া একজনের মন্তব্য শুনে জনৈক ট্যাক্সিচালক বলে উঠলেন,'আন্না ছিলেন একা, তাই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। এরা (এস ইউ সি আই) একটা সংগঠিত পার্টি। তাই এই আন্দোলন সহজে থেমে যাবে না এটাই আমার আশা।' ওই মানুষটি ঠিক উত্তরই দিয়েছেন। কিন্তু এই সঙ্গে আরেকটা জরুরি কথাও এস ইউ সি আই (সি) তুলে ধরেছে যে, দুর্নীতির আঁতুড়ঘর এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের লক্ষ্যে পরিচালিত না হলে যে কোনও আন্দোলন দিশা হারায়। যে কারণে আন্দোলন করতে করতে জনগণের সামনে বারবার এই কথাগুলি তুলে ধরছেন দলের স্বেচ্ছাসেবকরা। মানুষ এমনও বলছেন, এতদিন জানতাম এস ইউ সি আই শুধু পশ্চিমবঙ্গে আছে। এখন দেখছি দিল্লিতে তো বটেই, উত্তর ভারতের বহু জায়গায় আপনাদের সই সংগ্রহ চলছে। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি যখন ক্ষয় পাচ্ছে তখন আপনাদের বৃদ্ধি হচ্ছে দেখে ভালো লাগছে।

উত্তর ভারতে যে সমস্ত রাজ্যে দলের কাজ ইতিমধ্যেই আছে সেগুলি ছাড়াও হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডেও স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের মাধ্যমে আন্দোলনের বার্তা নিয়ে দিল্লি থেকে স্বেচ্ছাসেবকরা পৌঁছেছেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম এবং ত্রিপুরায় এস ইউ সি আই (সি) বহু দিন ধরেই কাজ করে চলেছে, সেই গণ্ডি ছাড়িয়ে মেঘালয়, সিকিমেও স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে, সেখানেও পাওয়া যাচ্ছে অভূতপূর্ব সমর্থন। একই ভাবে গোটা দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রও চলছে স্বাক্ষর সংগ্রহ।

গোটা ভারতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও মানুষ শুধু সমর্থন করছেন না সরাসরি আন্দোলনে অংশ নিচ্ছেন। কারণ এ আন্দোলনটা জনগণেরই। পুরুলিয়ার সাঁওতালডি থানার প্রান্তে ঝাড়খণ্ড-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে গোয়াই নদীর খেয়া নৌকোতে মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করছিলেন দলের স্বেচ্ছাসেবকরা। নৌকোর মাঝি দাবিপত্র চেয়ে নিয়ে তিন-চারদিন ধরে নদী পারাপার করতে করতেই দুই রাজ্যের মানুষের সই সংগ্রহ করে এস ইউ সি আই (সি)-র স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে করতে কোনও স্বার্থান্বেষী লোক উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্বেচ্ছাসেবকদের বাধা দেওয়া বা তর্কাতর্কির মধ্যে ফাঁসিয়ে দিয়ে সময় নষ্ট করার চেষ্টা করলে, সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছাসেবকদের বলেছেন, আপনারা নিজের কাজ করে যান, আমরা এর উত্তর দিচ্ছি। একদিন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের একটি ট্রেনের কামরায় ছাত্র-যুব কর্মীরা স্বাক্ষর সংগ্রহ করার সময় সিপিএমের কিছু কর্মী —আপনারাই তো তৃণমূলকে এনেছেন, এদের কৃতকর্মের জন্য আপনারাই দায়ী, এইসব বলে বারবার সই করাতে বাধা দিচ্ছিলেন। রুখে দাঁড়ালেন একজন হকার। তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন 'আপনারা কাদের কী বলছেন? এরা এস ইউ সি করে, এরা ছাড়া আর কে লড়ছে বলুন তো? আমি তৃণমূল করি, আমার দল ভুল করছে বলে ওদের দোষ দেব কী করে? আমি সত্যি কথাটা বলছি, আপনারাও সত্যি কথাটা বলুন।'এস ইউ সি আই (সি) দলের সঙ্গে তৃণমূলের ঐক্যের ভিত্তিতে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার ফলেই সিপিএমের অত্যাচারী শাসনের অবসানের জমি তৈরি হয়েছিল একথা মানুষ জানে। আবার এ দেশের পুঁজিপতিশ্রেণি এই দুই দলের ঐক্য ভাঙতে কীভাবে উঠে পড়ে লেগেছিল এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূলের ভূমিকা কী ছিল এস ইউ সি আই (সি) তা বহু আগেই মানুষকে বলেছে। কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের

গাডাগ, কর্ণাটক

সরকারে দলের অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত মানুষ সমর্থন করেছেন। দল নির্বাচনের আগেই বলেছিল, কংগ্রেস-সিপিএমের মতোই তৃণমূল সরকার একই রকম জনবিরোধী নীতি নিয়ে চললে আমরা তার বিরুদ্ধেও রাস্তায় নামব। মানুষ জানেন এই কথা আমরা রক্ষা করবই, এই হল এস ইউ সি আই (সি) -র রাজনীতি— যে রাজনীতি মানুষকে আশ্বস্ত করছে।

পুঁজিবাদী সমাজের লাগামছাড়া অত্যাচারে মানুষ কোণঠাসা। সীমাহীন মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, কর্মসংকোচন, কৃষকের ফসলের দাম নেই, তাদের ঘরে ঘরে হাহাকার, বাড়ছে আত্মঘাতী কৃষকের সংখ্যা। তার পাশাপাশি শিক্ষায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার সর্বনাশা সিদ্ধান্ত, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সর্বব্যাপক ব্যবসায়ীকরণের আক্রমণে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি) ছাড়া আর কোনও দল আন্দোলন করবে না একথা মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে জানে। তাই আন্দোলনের বার্তা নিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র কর্মীরা গেলে মানুষ তাঁদের সাদরে বরণ করে

বহরমপুর

নিচ্ছেন। বলছেন, আন্দোলন গড়ে তুলুন, আমরা এ দিকেই তাকিয়ে আছি। এই কথা বুকে নিয়েই সংসদের সামনে ১৪ মার্চ লক্ষাধিক মানুষের মিছিল বজ্রনির্ঘোষে তুলে ধরবে গোটা ভারতের সাধারণ মানুষের দাবি।

'গণস্বাক্ষর সংগ্রহ— এক মৌন বিপ্লব!'

(দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং ২নং ব্লকে (পূর্ব ক্যানিং) এস ইউ সি আই (সি)-র স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষক আবদুল গফফর নিচের বক্তব্যটি পাঠিয়েছেন।)

আর কতদিন জনগণ চুপ করে মার খেয়ে যাবে!

আগামী ১৪ মার্চ ৯ দফা দাবির ভিত্তিতে পার্লামেন্ট অভিযানের ডাক দিয়েছে এস ইউ সি আই দল। জনসমর্থন নিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি জেলায় জেলায় চলছে। সেদিন ক্যানিং ২নং ব্লকে দেখছিলাম সেই কর্মসূচি। সাড়া দেখে মনে হল স্বাক্ষর সংগ্রহই যেন গণআন্দোলন। এ যেন এক মৌন বিপ্লব।

ক্যানিং ২-নং ব্লক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে একটি পিছিয়ে পড়া ব্লক। দীর্ঘ ৩৪ বছর সিপিএমের অপশাসন এই ব্লকে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের বাকস্বাধীনতাটুকুও হরণ করে নিয়েছিল। আমার মনে হয়েছে, মানুষের মধ্যেকার ক্ষোভ আগামীতে এক বিরাট গণআন্দোলনের রূপ নেবে। রাজনৈতিক সন্ত্রাস, সিপিএম নেতাদের বহুরূপী চেহারা, মুখোশের আড়ালে লুকানো কুৎসিত আচরণ জনগণ দেখেছে, তবুও সন্ত্রাস এই ব্লকে গত নির্বাচনে সিপিএমকে জিতিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে তাদের প্রতিও মানুষ বিশ্বাস হারাচ্ছে। দিনমজুর, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার, প্রত্যেকের মধ্যে চাপা যন্ত্রণা। ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার মতো তুঘলকি সিদ্ধান্ত জনগণকে ক্ষুব্ধ করেছে। গণস্বাক্ষর অভিযান চলাকালীন দেখেছি, প্রত্যেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাক্ষর দিচ্ছেন। পার্টি তহবিলে অগ্রিম চাঁদা দিয়ে তবে স্বাক্ষর দিচ্ছেন—এও দেখা গেল। একজন সাধারণ মানুষ তো বলেই ফেললেন— এই দলটা ছাড়া এসব প্রতিবাদ কেউই করে না। যারাই ক্ষমতায় আসে তারাই ভক্ষক সেজে জনগণের উপর চাবুক চালায়। পাশ-ফেল তুলে দেওয়া নিয়ে দেখলাম গরিব মানুষও ক্ষিপ্ত। অসহায় বাবা-মায়ের বোবাকান্না হয়ত কোনওদিন রাইটার্সের অন্দরে পৌঁছবে না, কিন্তু তাদের করুণ আর্তি— তাদের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র যেন দিল্লির সরকারের কাছে জমা পড়ে।

জানি না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এই ব্যথা অনুভব করবেন কি না। 'বনদেশে শেয়াল রাজা' সেজে বসে না থেকে এখন কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেটাই দেখার বিষয়।

প্রতিহিংসার রাজনীতি

একের পাতার পর

এই ঘটনার পর স্বাভাবিক ভাবেই রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের বিষময় পরিণাম নিয়ে আলোচনা উঠেছে এবং স্বভাবতই সিপিএম শাসনের কথা তুলনা হিসাবে এসে যাচ্ছে। কথায় আছে জনস্মৃতি দুর্বল। কিন্তু সিপিএমের ৩৪ বছরের যে শাসন মাত্র ৮ মাস আগের ভোটে অপসারিত হয়েছে, তার স্মৃতি এখনই একেবারে মুছে যাওয়ার নয়। ফলে এই প্রতিহিংসামূলক হত্যাকাণ্ডের মধ্যে মানুষ সিপিএমের ছায়াই দেখছে। এ যেন সিপিএম শাসনেরই ধারাবাহিকতা। সিপিএম নেতারা রুষ্ট হয়ে বলছেন, সর্বত্র তুলনা হিসাবে তাদের নাম কেন টেনে আনা হচ্ছে। রুষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন, মানুষ তাঁদের অপশাসনের কথা অতি শীঘ্র ভুলে গিয়ে তৃণমূলের ভূমিকায় ক্ষিপ্ত হয়ে এখনই আবার সিপিএমের পিছনে গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তাঁদের সেই ভাবনা অবাস্তব। ফলে তুলনা হবেই। কারণ, মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় এনেছে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই।

৩৪ বছরের সিপিএম শাসনে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার, এমনকী স্বার্থসিদ্ধির পথ নিষ্কণ্টক করতে প্রতিপক্ষকে একেবারে নিকেশ করে দেওয়ার যে রাজনীতি মানুষ দেখেছে, তার সূচনাও কিন্তু এ রাজ্যে হয়েছিল ১৯৬৯ সালে সিপিএমের হাত ধরেই। স্বাধীনতার পর এ রাজ্যে গণআন্দোলনের উপর কংগ্রেস শাসকদের বীভৎস অত্যাচার মানুষ দেখেছে। গণআন্দোলনের কর্মীদের পুলিশের গুলিতে লাঠিতে হত্যা করেছে কংগ্রেস সরকার। কিন্তু দাগি ক্রিমিনালদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলকে খতম করার রাজনীতিটা তখনও কংগ্রেস রপ্ত করেনি। ১৯৬৯ সালে ১৪ দলের যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় সিপিএম-ই 'শ্রেণিভিত্তিক ফ্রন্ট' গড়ার আওয়াজ তুলে শরিক বামপন্থী গণতান্ত্রিক দলগুলিকে লাঠি বন্দুকের জোরে দুর্বল করার এমনকী ধ্বংস করার লাইন নিয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় এসেছিল ১৯৭২ সালের কংগ্রেসের সন্ত্রাস, প্রকাশ্যে রাজনৈতিক হত্যার বীভৎস পর্যায়। ১৯৭৭ সালে সিপিএম একক শক্তিতে সরকারি ক্ষমতায় আসে। প্রথম কয়েক বছর সন্ত্রাস ও প্রতিহিংসার পথ এড়িয়ে চলে কালক্রমে আপন মূর্তি ধরে সিপিএম। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯০-এর দশকের প্রায় শেষ পর্যন্ত তাদের এই আক্রমণের প্রধান টার্গেট হয়েছে এস ইউ সি আই (সি)। কারণ, ১৯৭৯ সাল থেকে সিপিএম সরকারের সমস্ত রকম জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে, বামপন্থার নামে বামপন্থাকে কলুষিত ও খতম করার বিরুদ্ধে এই একটি দলই রক্ত দিয়ে প্রাণ দিয়ে কর্মীদের জেলজীবনকে বরণ করে নিয়ে প্রতিবাদে আন্দোলনে অবিচল থেকেছে। নামে বিরোধী হিসাবে কংগ্রেস থাকলেও, বিধানসভায় কিছু এম এল এ-র আসন ছাড়া কোথাও তাদের বিরোধিতা মানুষ দেখতে পায়নি। এক গভীর বোঝাপড়া নিয়ে চলেছে সিপিএম ও কংগ্রেস।

১৯৭৯ সালের ১৫ জুন এস ইউ সি আই (সি)-র আইন অমান্য আন্দোলন থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী কালে মূল্যবৃদ্ধি, ভাড়াবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, এমনকী শিক্ষা আন্দোলনেও বার বার পুলিশি অত্যাচার নেমে এসেছে। গণআন্দোলনে পুলিশি নিপীড়ন সব সরকারই করেছে। কিন্তু এর সাথে যেটা সিপিএম যোগ করল, যার ভয়ঙ্কর চেহারা পরবর্তীকালে নন্দীগ্রামে দেখা গেল, তা হচ্ছে বিরোধীদের আন্দোলন ভাঙতে প্রথমে লাঠি হাতে কর্মীদের নিয়োগ, ধীরে ধীরে যার জায়গা নিল সিপিএমের পতাকা হাতে দাগী দুর্বৃত্তরা। ১৯৮৩ সালে ভাড়াবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন ভাঙতে এস ইউ সি আই (সি)-র মহিলা কর্মীদের বিরুদ্ধে সিপিএম তার ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীকে এগিয়ে দিয়েছিল। প্রকাশ্য রাস্তায় সেই সিপিএম দুষ্কৃতীরা গণআন্দোলনের কর্মীদের উপর লাঠি চালিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনি।

পাশাপাশি চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়া, বর্ধমান সহ বিভিন্ন জায়গায় এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের উপর নিরন্তর হামলা, মিথ্যা মামলায় জেলে পোরা। ১৯৯০ সালে মূল্যবৃদ্ধি-ভাড়াবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে সরকারের নির্দেশে পুলিশ যেভাবে ৩২ জন এস ইউ সি আই (সি) কর্মীকে গুলিবিদ্ধ করেছিল, কিশোর কর্মী মাধাই হালদারকে হত্যা করেছিল, তা কি সিপিএমের প্রতিহিংসার রাজনীতির প্রতিফলন ছিল না? শুধু দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাতেই সিপিএম দাগি খুনিদের দিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র ১৫০ জন নেতা ও কর্মীকে হত্যা করেছে। তেভাগা আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা দলের কৃষক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক প্রবীণ কমরেড আমির আলি হালদারকে জয়নগরে তাঁর বাড়ির সামনে দিনের আলোয় খুন করিয়েছে। আজও অপরাধীদের শাস্তি হয়নি। এই খুনি-দুষ্কৃতীদের প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করেছেন সিপিএমের এক মন্ত্রী। সিঙ্গুরে তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে আগুনে পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্রের পিছনে সিপিএম নেতাদের নাম উঠে এসেছে। জেলায় জেলায় বিশেষ বিশেষ সিপিএম নেতারা ডাকাত ও দাগি খুনিদের সংগঠক হিসাবে গোটা রাজ্যে পরিচিত হয়েছেন। সিপিএম নেতারা কংগ্রেস শাসনে বক্তৃতায় বলতেন, তাঁদের দলের ১১০০ কর্মী কংগ্রেস আমলে খুন হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন কোন কুখ্যাত পুলিশ অফিসার যুক্ত তাও তাঁরা উল্লেখ করতেন। বিরোধী আসনে থেকে তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কর্মীদের খুনের তদন্ত হবে, দোষী পুলিশের বিচার হবে। কিন্তু কোনও কিছুই হয়নি। বরং কংগ্রেস আমলের কুখ্যাত পুলিশ অফিসাররা সিপিএম আমলে প্রোমোশন পেয়ে উচ্চ পদে আসীন হয়েছেন। কিন্তু কেন? কারণ, বামপন্থী নাম নিয়ে যে শাসন তাঁরা এখানে চালিয়েছেন, তা আদতে ছিল জনবিরোধী, বামপন্থা বিরোধী, গণআন্দোলন বিরোধী। তেমন একটা শাসনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হলে স্তরে স্তরে দলীয় আধিপত্য স্থাপন করতে হলে, রাজনীতি যেখানে দেউলিয়া, সেখানে আমলা ও পুলিশনির্ভর হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আর নন্দীগ্রামের ইতিহাস তো সকলেই জানেন। এভাবে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের বিষবৃক্ষে সিপিএম ৩৪ বছর ধরে জলসেচন করে গেছে। দুর্ভাগ্যের কথা, সিপিএম সরকার থেকে চলে গেলেও তার বিষময় পরিণাম থেকে আজও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রেহাই পাচ্ছে না।

কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস কেন সিপিএমের খুন-সন্ত্রাসের রাজনীতি, দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতির বিরুদ্ধে এত কথা বলে, তা বন্ধ করার এত প্রতিশ্রুতি দিয়েও আজ সেই একই রাজনীতি করে চলেছে? এই প্রশ্ন আজ রাজ্যের বিরাট অংশের মানুষকে তাড়িত করছে। কারণ তাঁরাই বড় আশা নিয়ে এদের ভোট দিয়েছিলেন। তাঁদের কেউ ভাবছেন, তা হলে পরিবর্তন কোথায় হল? তবে কি পরিবর্তন আসলে কিছুই হওয়ার নয়— সবই কেবল দলের রঙ বদল? কেউ ভাবছেন, সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন আসলে কোনও দিনই হবে না, এ কেবলই শাসকের পরিবর্তন। এমনই নানা ভাবে মানুষ এই পরিণতিকে বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ হচ্ছেন।

আসলে এই দুই দলের রাজনীতিই হল ক্ষমতা দখলের রাজনীতি। যার সাথে জনস্বার্থ তথা জনকল্যাণের কোনও সম্পর্ক নেই। সিপিএম নামে কমিউনিস্ট হলেও, দলের নামের পাশে 'মার্কসবাদী' লেখা থাকলেও বাস্তবে দলটি কোনও দিনই মার্কসবাদের চর্চা করেনি। সেই অর্থে শ্রমিক শ্রেণির দলও হয়ে উঠতে পারেনি। মুখে মার্কসবাদের কথা, শ্রমিক স্বার্থের কথা বলতে বলতেই মালিক শ্রেণির স্বার্থই বরাবর রক্ষা করেছে। পুঁজিবাদ আজ মুমূর্ষু, চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল। আজ এই পচা পুঁজিবাদের স্বার্থ দেখবে যে দল, সেই দল কখনওই জনগণের স্বার্থে, শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে কাজ করতে পারে না, তেমনই পুঁজিবাদের মতোই সে দুর্নীতিগ্রস্ত নীতিহীন হতে বাধ্য। আর নীতিহীন আদর্শহীন একটি দলকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে যেমন খুন-সন্ত্রাসের রাজনীতি ছাড়া, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ছাড়া উপায় থাকে না, তেমনই জনস্বার্থের পরিবর্তে মালিক শ্রেণির স্বার্থ দেখাও এইভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার অন্যতম শর্ত, যার চূড়ান্ত প্রকাশ রাজ্যের মানুষ দেখেছে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে।

একইভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনীতিরও মূল কথা, সরকারি ক্ষমতা দখল। যে কোনও উপায়ে দলের প্রভাবের এলাকা বাড়ানো। সকল বুর্জোয়া দলেরই আজ এই পরিণতি। গণতন্ত্র, সততা, নৈতিকতা, উন্নত সংস্কৃতি, মূল্যবোধ আজ আর কোথাও কোনও বুর্জোয়া রাজনীতিতেই পাওয়া যাবে না। জনকল্যাণই যদি কোনও সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে জনগণের উপর নির্ভরতা ছাড়া কখনও সেই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। সে উদ্দেশ্য ছিল না বলেই সিপিএম সরকার জনগণের পরিবর্তে আমলা পুলিশ এবং দুষ্কৃতীনির্ভর হয়ে উঠেছিল। আজ তৃণমূল কংগ্রেসও একইভাবে সরকার পরিচালনায় একদিকে আমলা ও পুলিশনির্ভর, অন্যদিকে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে দুষ্কৃতীনির্ভর হয়ে সিপিএমের পথেই চলেছে। আসলে যে দলই জনস্বার্থের পরিবর্তে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে কাজ করবে তাদেরই এই পরিণতি ঘটবে। জনসাধারণের কল্যাণ, প্রশাসনের নিরপেক্ষতা প্রভৃতি বিষয়গুলি একটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে কারও ব্যক্তিগত মত, ইচ্ছা বা সততার উপর নির্ভর করে না। সমাজের বিকাশের নিয়মেই পুঁজিবাদ আজ প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র অর্জন করেছে। এর আর ক্ষমতা নেই মানুষের কল্যাণ করার। তবুও সদিচ্ছা থাকলে পুলিশ-প্রশাসনকে খানিকটা নিরপেক্ষ ভাবে চালানো, মন্ত্রী আমলা পুলিশ কর্মচারীদের খানিকটা দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব হত। কিন্তু সেই সদিচ্ছারও অভাব আজ সরকারের পদে পদে দেখা যাচ্ছে। এমন অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ মানুষের দ্রুত মোহভঙ্গ হচ্ছে।

সিপিএম শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ ও তীব্র ঘৃণা, এস ইউ সি আই (সি)-র লাগাতার গণআন্দোলন এবং সর্বশেষ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঐতিহাসিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে সেই সরকারকেও তার প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য করতে হলে প্রয়োজন গণআন্দোলনকে অব্যাহত রাখা। কারণ গণআন্দোলনের চাপই একমাত্র পারে জনস্বার্থে নীতি গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করতে।

বর্ধমানে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ বুদ্ধিজীবী মঞ্চের

শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী ২৩ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, বর্ধমানের দেওয়ানদিঘিতে গতকাল দুষ্কৃতীদের হাতে দুই সিপিএম নেতার নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিন্দনীয় ও গভীর উদ্বেগজনক। নির্বাচনে বিজয়ের পর তৃণমূল কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল, তারা সিপিএম সৃষ্ট হিংসা-খুন-সন্ত্রাসের রাজনৈতিক পরিবেশের বদল ঘটিয়ে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনবে। বাস্তবে আমরা তা দেখছি না, বরং সেই ধারাবাহিকতাই চলছে। এ জিনিস মেনে নেওয়া যায় না। পশ্চিমবাংলার মানুষ একটি দলের হিংসাত্মক শাসনের বদলে আর একটি দলের অনুরূপ শাসনপ্রতিষ্ঠা চায়নি। আমরা সরকার ও শাসক দলের কাছে দাবি করছি, অবিলম্বে খুনিদের গ্রেপ্তার করতে হবে, কঠোর হাতে এই হত্যার রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

২৮ ফেব্রুয়ারির সাধারণ ধর্মঘট প্রসঙ্গে

২৮ ফেব্রুয়ারির 'সাধারণ ধর্মঘট' প্রসঙ্গে শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি অধ্যাপক তরুণ সান্যাল বলেন, সিপিএম শাসনে আমরা দেখেছি, বিরোধী দল বা সংগঠন ধর্মঘট বা বনধ ডাকলে তা ব্যর্থ করার জন্য প্রশাসনিক তৎপরতার সাথে শাসকদলের কর্মীবাহিনীকে লাঠিসোঁটা নিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হত। ২৮ ফেব্রুয়ারি কিছু সংগঠনের ডাকা সাধারণ ধর্মঘট সম্পর্কে বর্তমান মন্ত্রী ও শাসক দলের নেতাদের মুখেও একই হুমকি শোনা যাচ্ছে। জনসাধারণ কোনও ধর্মঘট বা বনধে সাড়া দেবেন কি না, সেটা তাঁরাই স্থির করবেন। ২৮ ফেব্রুয়ারির সাধারণ ধর্মঘট নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস মন্ত্রী ও নেতারা যেভাবে হুমকি দিচ্ছেন, তা অগণতান্ত্রিক। আমরা এর প্রতিবাদ করছি।

বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ স্মরণে সুরাটে সভা

গণদাবীর স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য তথ্য

ফরম ৪ (রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। *প্রকাশের স্থান ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০০১৩*

২। *প্রকাশের কাল ঃ সাপ্তাহিক*

৩। *মুদ্রকের নাম ঃ মানিক মুখার্জী*
জাতি ঃ ভারতীয়
ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী
কলকাতা-৭০০০১৩

৪। *প্রকাশকের নাম ঃ*
মানিক মুখার্জী
জাতি ঃ ভারতীয়
ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী
কলকাতা-৭০০০১৩

৫। *সম্পাদকের নাম ঃ*
মানিক মুখার্জী
জাতি ঃ ভারতীয়
ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী
কলকাতা-৭০০০১৩

৬। *স্বত্বাধিকারী ঃ*
সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০০১৩

আমি, মানিক মুখার্জী, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানমতে সত্য।

মানিক মুখার্জী
প্রকাশকের স্বাক্ষর

১-৩-২০১২

মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃতি ও বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছেন স্ট্যালিন

শিবদাস ঘোষ

একের পাতার পর

বুখারিনপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃতি ও বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট ও বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারের অধিকতর ভাঙনের যুগের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ সত্যগুলিকে তুলে ধরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সমৃদ্ধ করেছেন। লেনিনবাদের সমস্যা প্রসঙ্গে, জাতিগত সমস্যার প্রশ্নে, ভাষা সমস্যা সম্পর্কে, সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের সমস্যা প্রসঙ্গে এবং বিশেষ করে বিপ্লবী সমরবিজ্ঞান প্রসঙ্গে স্ট্যালিনের রচনাগুলি বিপ্লবী বিজ্ঞানের অমূল্য সম্পদ। একজন মহান কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে স্ট্যালিনের যে নেতৃত্বকারী ভূমিকা, তাকে খাটো করা — যা বাস্তবে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা তাঁর রচনাগুলি প্রকাশ বন্ধ করে দিয়ে করেছেন — এর অর্থ হল, ইতিহাসে তাঁর যোগ্য মূল্য দিতে অস্বীকার করা। *প্রকৃতপক্ষে, লেনিনবাদ সম্পর্কে সোস্যাল ডেমোক্রেসি ও ট্রটস্কিবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন যে উপলব্ধি নিয়ে বর্তমানে আমরা চলেছি — সেটা স্ট্যালিনেরই অবদান।* ট্রটস্কি নিজেকে বলতেন লেনিনবাদী, যদিও লেনিনবাদের উপলব্ধির ক্ষেত্রে স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য ছিল। ট্রটস্কির অনুগামীরাও নিজেদের লেনিনবাদী বলতেন, লেনিনকে অথরিটি মানতেন, কিন্তু যেটা তাঁরা মানতে পারতেন না তাহল, লেনিনবাদ সম্পর্কে স্ট্যালিনের ব্যাখ্যা। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের যে উপলব্ধি স্ট্যালিন তুলে ধরেছেন, তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করার জন্যই সোস্যাল ডেমোক্র্যাট এবং ট্রটস্কিবাদীদের আজ কমিউনিস্ট বলে মনে হয় না। *লেনিনবাদ সম্পর্কে স্ট্যালিনের উপলব্ধিই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের গঠিত উপলব্ধি, এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই সাম্যবাদী আন্দোলন বর্তমান স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।* আগামী দিনে নূতন নূতন সমস্যা, বহু নূতন ঘটনার আলোকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অবশ্যই আরও সমৃদ্ধ হবে; কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে মৌলিক উপলব্ধি স্ট্যালিন তুলে ধরেছেন, তা থাকবে; মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আরও উন্নত, আরও সমৃদ্ধ উপলব্ধি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশ্বের কমিউনিস্টদের তা পথ দেখাবে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁর পূর্বসূরী মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের মতো স্ট্যালিনও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে একজন অথরিটি। তাই, স্ট্যালিনকে মুছে ফেলার অনিবার্য পরিণাম হল তাঁর অথরিটিকে অস্বীকার করা; যার অর্থ লেনিনবাদ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি — যেটি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে আজকের দিনের সঠিক উপলব্ধি — তাকেই অস্বীকার করা। স্ট্যালিনের অথরিটিকে যদি অস্বীকার করা হয়, তাহলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাণসত্তাকে রক্ষা করতে ট্রটস্কিবাদী এবং বুখারিনপন্থীদের বিরুদ্ধে যে নিরলস সংগ্রাম স্ট্যালিন পরিচালনা করেছিলেন, আগামী প্রজন্মের কাছে ইতিহাসের সেই অধ্যায় মসীলিপ্ত, তমসাচ্ছন্ন থেকে যাবে; তার ফলে সুদৃঢ় আদর্শগত প্রত্যয় গড়ে তোলার সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবে। এর দ্বারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে যাবতীয় প্রতিবিপ্লবী চিন্তাভাবনা আমদানীর রাস্তা খুলে দেওয়া হবে এবং সাম্যবাদী আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তিটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। *এককথায়, এর দ্বারা মহান লেনিন তথা লেনিনবাদের মর্যাদাকেই কার্যত ভূলুণ্ঠিত করা হবে।*

তত্ত্বগত ক্ষেত্রে অনন্য ক্ষমতার অধিকারী হিসাবেই শুধু নয়, সাম্যবাদী আন্দোলনের একজন অসামান্য সংগঠক হিসাবেও মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের সঙ্গে স্ট্যালিনও আমাদের স্মৃতিপটে অম্লান হয়ে থাকবেন। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন লেনিন, আর স্ট্যালিন তাকে শান্তি ও সমাজতন্ত্রের দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করেছেন। যে তৃতীয় আন্তর্জাতিক লেনিন প্রতিষ্ঠা করেছেন, স্ট্যালিনই নেতৃত্ব দিয়ে সেই ক্ষুদ্র সংগঠনটিকে বিরাট শক্তির আধারে পরিণত করেছেন। তাছাড়াও, দেশে দেশে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও স্ট্যালিনের নেতৃত্ব পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলিতে — গুরুতর ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা এবং সাময়িক পরাজয় সত্ত্বেও — সাম্যবাদী আন্দোলনের যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি, বিকাশ ও সাফল্য তাও স্ট্যালিন নেতৃত্বেরই কৃতিত্ব। একথা ঠিক যে, লেনিনই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন; *কিন্তু স্ট্যালিন সেই ভিত্তির ওপর পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বগত কাঠামোটি গড়ে তুলেছিলেন, তিনিই এই নীতিকে সোভিয়েট বিদেশনীতির মূল স্তম্ভে পরিণত করেছিলেন যার ওপর সোভিয়েট বিদেশনীতি এমনকি আজও দাঁড়িয়ে আছে।* দুই সমাজব্যবস্থা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির ধারণাকে একটা তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং সোভিয়েট বিদেশনীতির মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য ট্রটস্কির অনুগামীরা লেনিনকে নয়, বরং স্ট্যালিনকেই প্রতিবিপ্লবী, শ্রেণী-সমঝোতাবাদী বলে আক্রমণ করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তত্ত্বে ও প্রয়োগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্ট্যালিনের ভূমিকাকে আজ অস্বীকার করা হচ্ছে, শুধু তাই নয়, অতি সূক্ষ্মভাবে এমন একটা প্রচারও চালানো হচ্ছে যাতে এ ধরণা গড়ে ওঠে যে, ক্রুশ্চেভই যেন এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তত্ত্বের রূপকার। আর স্ট্যালিনের অনুগামীরা সকলেই শান্তিপূর্ণ সহবস্থান নীতির বিরোধী, তাঁরা কেবলই যুদ্ধের রাস্তায় যেতে চান এবং এদের বিরুদ্ধেই যেন ক্রুশ্চেভ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতির যে বিশ্লেষণ স্ট্যালিন তুলে ধরেছেন, দুই বিশ্বব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তত্ত্বের যে উন্নত উপলব্ধি তিনি দিয়েছেন, এবং এই তত্ত্বের ভিত্তিতে যে সোভিয়েট বিদেশনীতি তিনি গড়ে তুলেছেন এবং এধরনের আরও বহু অবদান যা তিনি রেখে গিয়েছেন — সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্ব হুবহু সেগুলিই তুলে ধরেছেন, সেগুলিই অনুসরণ করছেন, কিন্তু কোথাও স্ট্যালিনের অবদানকে স্বীকার করছেন না। আমরা মনে করি, এই আচরণ কমিউনিস্ট নৈতিকতার বিরোধী। নেতা তো বটেই, এমনকি একজন সহযোদ্ধাও যে জায়গাটাতে তুলনামূলকভাবে বড়, তার স্বীকৃতি দিলে কেউ নিজে ছোট হয়ে যায় না; বরং অপরের গুণাবলীর স্বীকৃতি দিতে পারলে তা কমিউনিস্ট হিসাবে নিজেকে আরও বড় করে গড়ে তোলার পথে সাহায্য করে। যিনি অহম্‌বোধের একটি ফানুস, আত্মম্ভরিতা হাম্‌বড়াভাবে যিনি ভরা তিনিই ব্যক্তিপূজাবাদের শিকার হন। একইভাবে যিনি সচেতনভাবে অপরের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে খাটো করে দেখান, তিনিও উল্টো দিক থেকে ব্যক্তিপূজাবাদেরই চর্চা করেন। দল ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে স্ট্যালিনের বিরাট অবদানকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েও কার্যত সেই একই ব্যক্তিপূজাবাদের চর্চা চলেছে। ...

(শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড)

আর্থিক বৃদ্ধির তথ্যে মানুষের পেট ভরে না

আসন্ন কেন্দ্রীয় বাজেট

গত বছর দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের দ্বিতীয় দফা বাজেট নিয়ে কংগ্রেস নেতারা দেশ জুড়ে শোরগোল তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের ভাষায় সেটা ছিল 'আম আদমি'র বাজেট। ইউ পি এ সরকার আর দিন পনেরোর মধ্যে তাদের তৃতীয় বাজেট পেশ করতে চলেছে। সেই আম আদমি আজ কেমন আছে?

ভাল আছি বলবার লোক দেশে আছে বটে কিন্তু তাঁরা আর যাই হোন এ দেশের 'আম আদমি' যে নন এ কথা খোদ কংগ্রেস নেতারাও স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। কারা সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি! চোখ বুজে যে কেউ বলবে, তারা দেশের ধনী সম্প্রদায়। সরকার মানবে কি না ঠিক নেই, কিন্তু দেশের মানুষ জানে এ কথা কতবড় সত্য। সরকারি মন্ত্রীরা ভোটের বাজারে মঞ্চ কাঁপিয়ে যাই বলুন না কেন, সরকারি সংস্থা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্স বলেছে বিদায়ী আর্থিক বছরে প্রত্যক্ষ কর অনাদায়ী রয়েছে চল্লিশ হাজার কোটি টাকা। প্রত্যক্ষ কর কারা দেয়? প্রত্যক্ষ কর মূলত দেয় বৃহৎ আয় যারা করে তারা। আয়কর হিসাবে এছাড়া কোম্পানি কর, কর্পোরেট কর, উৎপাদন শুল্ক ইত্যাদি কর প্রত্যক্ষ ভাবে মালিকদের দিতে হয়। কিন্তু সরকারের বেশিরভাগ আয় আসে পরোক্ষ করের মাধ্যমে। যা দেন দেশের সাধারণ মানুষ। ভ্যাট, বিক্রয় কর, এক্সাইজ ডিউটি, নানা ধরনের সারচার্জ ইত্যাদি জিনিসের দাম বা অন্যান্য কিছুর সাথে মালিকরা মানুষের কাছ থেকে আদায় করে, সরকারের ঘরে জমা দেয়। কিন্তু এই কর আসলে দেন সাধারণ মানুষ। তাই পরোক্ষ কর যত বাড়ে তত বেশি করে সাধারণ মানুষের পকেটে টান পড়ে। দীর্ঘদিন ধরেই দেশে শিল্পায়নের অজুহাত তুলে মালিকদের সুবিধা দিতে প্রত্যক্ষ কর কমানো হচ্ছে। এর ফলে সরকারের যে রাজকোষ ঘাটতি হচ্ছে তা মেটাতে জনগণের উপর বাড়ানো হচ্ছে পরোক্ষ কর। একই সাথে কমছে সাধারণ মানুষের জন্য যেটুকু ছিটে ফোঁটা ভর্তুকি চালু ছিল তার পরিমাণ। কমছে সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে সরকারি ব্যয়। গত আম আদমির বাজেটে মালিকদের জন্য প্রত্যক্ষ কর কমানো হয়েছিল ১১৫০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের দেয় পরোক্ষ কর বেড়েছিল ১১৩০০ কোটি টাকা। মালিকদের জন্য উৎপাদন শুল্ক ও পরিষেবা কর কমার ফলে সরকার রাজস্ব হারিয়েছিল ৩৫ হাজার কোটি টাকা। কর্পোরেট সারচার্জ কমেছিল ২.৫ শতাংশ যার ফলে সরকার যে কয়েক হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারালো তা পুষিয়ে দেওয়ার জন্য গণবণ্টন ব্যবস্থায় বরাদ্দ কমেছিল ৬৪০৭.৫ কোটি টাকা, খাদ্য ভর্তুকি কমেছিল ২৭ কোটি টাকা। বিভিন্ন সরকারি সংস্থার শেয়ার বেচে বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে ৪০ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করা ও ১৫ হাজার কোটি টাকার নোট ছাপিয়ে ঘাটতি পুষিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন সরকারি নেতারা। ফলে বিপুল মুদ্রাস্ফীতি অর্থাৎ ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির চাপে জনজীবন বিপর্যস্ত। অথচ সরকারি কর্তা থেকে মিডিয়া সকলে একযোগে প্রচার তুলেছে সরকারের রাজকোষ ঘাটতির কারণ নাকি সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিকদের জন্য সরকারের ভর্তুকি।

সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান সি রঙ্গরাজন বলেছেন আর্থিক সংকট কাটাতে সরকারের উচিত পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, ইউরিয়া সারে ভর্তুকি কমিয়ে দাম বাড়ানো। এরা সকলেই একমত যে সরকারকে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশের মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে জানেন এই কড়া পদক্ষেপের অর্থ কী। কড়া পদক্ষেপ মানে মালিকদের কাছ থেকে অনাদায়ী প্রত্যক্ষ কর আদায়ের কথা যে বলা হয়নি, তা তো রঙ্গরাজনের কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এই কড়া পদক্ষেপ মানে জনগণের উপর আরও ট্যাক্স চাপানো, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ পরিষেবা খাতে বরাদ্দ কমানো। উদার অর্থনীতির দুনিয়ায় জনগণের জন্য এতটুকু উদারতা নেই। খোদ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সরকারি ব্যয় সংকোচ করার কথা বলার পরেই প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলেছেন কর্পোরেট ট্যাক্স কমিয়ে শিল্পপতিদের বাড়তি স্বস্তি দিতে হবে। অথচ তাঁর নিজের দেশের মানুষ 'ওয়াল স্ট্রিট দখল করো' আন্দোলনে আওয়াজ তুলেছে, এই কর্পোরেট হাঙরদের হাত থেকে দেশের মানুষ কে মুক্ত করতে হবে। গোটা বিশ্বেই আজ এই আওয়াজ উঠেছে। তীব্র সংকটে জর্জরিত কর্পোরেট পুঁজির সর্বোচ্চ লাভ সুনিশ্চিত করতে গিয়ে মানুষের জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি এমনকী বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও আজ কেড়ে নিয়েছে পুঁজিবাদী সমাজ।

দেশের মানুষকে আশ্বস্ত করতে রঙ্গরাজন বলেছেন, দেশে আর্থিক বৃদ্ধি হতে চলেছে ৮ শতাংশ। যদিও সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিকাল অর্গানাইজেশন বলেছে এই বৃদ্ধি কোনও মতেই ৬.৯ শতাংশের বেশি হতে পারে না। কিন্তু রঙ্গরাজনের মতে জানুয়ারি মাস থেকে দেশের বাজারে বিদেশি লগ্নি আসা শুরু হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে নাকি আর্থিক বৃদ্ধির পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। যদিও বিদেশি লগ্নি এলে সাধারণ মানুষের কী লাভ সে কথা তাঁরা কোনও দিনই খোলসা করে বলেন না। অভিজ্ঞতা বলছে ২০০৩ থেকে ২০০৭-এর মধ্যে দেশে বিদেশি বিনিয়োগ সর্বাধিক বৃদ্ধি পেলেও সেই কয় বছরে কর্মসংস্থানের হার ছিল সর্বনিম্ন। আর্থিক বৃদ্ধির হার নিয়ে যে কথা কর্তারা বলছেন তাও ঠিক নয়। শীর্ষ স্তরের শিল্পপতিদের সংগঠন সি আই আই বলছে শিল্পে উৎপাদন কমছে। ম্যানুফাকচারিং শিল্পে বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন। ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি কমেছে ১.৩ শতাংশ হারে। খনি এবং বৃহৎ শিল্পের বৃদ্ধি ঋণাত্মক। সি আই আই আশঙ্কা করছে আগামী আর্থিক বছরে ব্যাপক কর্মসংকোচন হবে। কমছে কৃষি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান। এ দেশে রপ্তানি নির্ভর ফসলের চাষ বৃদ্ধি, কৃষি ক্ষেত্রে বহুজাতিক পুঁজির অবাধ অনুপ্রবেশের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে বৃদ্ধির যে চিত্র সরকার তুলে ধরছে তার সঙ্গে বাস্তব চিত্র মিলছে না। বরং কৃষিপণ্যের বাজারে বড় বেশি বহুজাতিক কোম্পানি ঢুকেছে সেই ক্ষেত্রেই কৃষকদের আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়েছে। ঋণের ফাঁসে জড়িয়ে প্রতি তিরিশ মিনিটে একজন চাষি এদেশে আত্মহত্যা করে এটাই তো বাস্তব চিত্র। সরকারের সংস্থা ন্যাশনাল লেবার ব্যুরো বলছে, গ্রামে কর্মসংস্থান দ্রুত কমছে।

এদিকে যে আমেরিকান পুঁজির আউট সোর্সিং-এর উপর ভিত্তি করে সরকারি কর্তারা বিদেশি পুঁজির আগমন নিয়ে দেশের মানুষকে সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখাচ্ছেন তাও অনিশ্চিত। আমেরিকার আসন্ন নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে ওবামা ঘোষণা করেছেন আউট সোর্সিংয়ের উপর কর বসানো হবে। আমেরিকার ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার সামনে তাদের এই কথা বলতেই হচ্ছে। যার ফলে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি, ব্র্যান্ডেড পোষাক তৈরির মতো আউট সোর্সিং নির্ভর শিল্পে ঘনিয়েছে তীব্র সংকট। রঙ্গ রাজনের আর্থিক বৃদ্ধির হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই ঘটবে। অথচ গোটা ইউরোপ আমেরিকার অর্থনীতির শোচনীয় হাল আজ সর্বজনবিদিত। এই প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বাজারে বৃদ্ধি ঘটার দাবি কতটা অন্তঃসারশূন্য তা তাঁরা নিজেরাই জানেন।

কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিকাল অর্গানাইজেশনের রিপোর্ট অনুসারে রাজকোষ ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা ৪.৬ শতাংশ। যার ফলে আবার মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে। কমবে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা, বাড়বে পুঁজিবাদী বাজারের সংকট। যার বোঝা আবার চাপিয়ে দেওয়া হবে সাধারণ মানুষের উপর। বোঝাই যায় আবার নতুন বাজেটে দেশের মন্ত্রীরা অনেক বাগাড়ম্বর করবেন কিন্তু তার আড়ালে দেশের মানুষের চোখের জল, আর্তনাদ ঢাকা পড়বে না। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, বন্ধ কলকারখানার সংখ্যা, শিশু শ্রমিক, চাষিদের আত্মহত্যা, পানীয় জলের হাহাকার, সর্বস্তরে আকণ্ঠ দুর্নীতি আর দারিদ্রসীমার দীর্ঘ তালিকা বলে দেয় 'আম আদমি' কেমন আছে। স্বাধীন দেশে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম প্রভৃতি দলের সরকারের বাজেটে কেবলই ধনবৈষম্য বেড়েছে। আগামী বাজেটেও এর ব্যতিক্রম হবে না।

জনতার দাবি চিকিৎসার সুযোগ

একের পাতার পর

স্মারকলিপি। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর কাছে পেশ করার উদ্দেশ্যে যে দাবিপত্রে রাজ্যে রাজ্যে গত ডিসেম্বর মাস থেকে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চলছে, তার অন্যতম দাবি — সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যবসায়ীকরণ ও বাণিজ্যিকরণ বন্ধ করতে হবে, অসুস্থতায় বিনামূল্যে ওষুধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহ যাবতীয় চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার সাধারণ মানুষকে দিতে হবে।

ওষুধের দাম নির্ধারণের ক্ষমতা বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলোর হাতে। সরকারি কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। সরকার হাত গুটিয়ে নিয়ে তাদের দেদার মুনাফা লুটতে দিয়েছে। ওষুধের দাম বেড়েছে বহুগুণ। এদিকে অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত কমেই চলেছে। সরকার নিয়োজিত অর্জুন সেনগুপ্ত কমিশনের রিপোর্ট — দেশের ৭৭ শতাংশ মানুষ এমনই দুর্দশাগ্রস্ত যে, তাদের দৈনিক আয় ৯ থেকে ২০ টাকার মধ্যে। এই মানুষগুলি খাবে কী, আর অসুস্থ হলে চিকিৎসার খরচ বইবে কী করে!

কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত 'কে শ্রীনাথ রেড্ডি কমিটি' সরকারের কাছে তাদের পেশ করা রিপোর্টে বলেছে, রাজ্যে রাজ্যে সরকারগুলোর ওষুধের জন্য কম অর্থ বরাদ্দ করা এবং তার ফলে হাসপাতালে বিনামূল্যে ওষুধ না পাওয়ার কারণে দেশের মানুষ সরকারি হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতি আস্থা হারাচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশের ৬৪ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ওষুধ কিনতে পারে না। যদিও বাস্তব অবস্থা এর থেকে আরও ভয়াবহ, তবু 'হু'-র তথ্যটিকে গ্রহণযোগ্য হিসাবে ধরলে দেখা যাচ্ছে, ১২০ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে প্রায় ৬৫ কোটি মানুষ, অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি মানুষের নিজেদের চিকিৎসার ওষুধ কেনার সামর্থ্য নেই।

সরকারি তথ্য তুলে ধরে ভারতের পরিকল্পনা কমিশনকেও স্বীকার করতে হয়েছে, অভাবের কারণে ২০০৪ সালে ভারতের গ্রামগুলোর প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ এবং শহরের ২০ শতাংশ মানুষ চিকিৎসা করাতে না পেরে নীরবে রোগের জ্বালা সহ্য করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু, তারপর তাঁদের কী মর্মান্তিক পরিণতি হয় — সেই সত্য পরিকল্পনা কমিশন উচ্চারণ করতেও সাহস করেনি। এইভাবে চিকিৎসার অভাবে, রোগের জ্বালায় মানুষ ছোটে কুসংস্কারাচ্ছন্ন 'তেলপড়া', 'জলপড়া' ও 'মাদুলি-কবচের' আখড়ায়। সেখানে আশ্বাসবাণী শোনে — 'রাখে হরি মারে কে' কিংবা 'মালিকের কুদরতির ওপর ভরসা রাখো'। এমনিভাবেই অকালে দেশের কত মানুষ যে মৃত্যুর গহ্বরে তলিয়ে যান, ৬৪ বছরের স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের কোনও সরকার বা পরিকল্পনা কমিশন— কেউ কি তার হিসাব রাখে!

কলকাতা হাইকোর্টে স্বাক্ষর দিচ্ছেন আইনজীবীরা

ব্যয়বহুল চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিণামে শুধু যে অসুস্থদের অকালমৃত্যু ঘটছে তাই নয়, পরিবারের অসুস্থ সদস্যদের চিকিৎসা করাতে গিয়ে পরিবার ক্রমেই সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রায় ৭০ শতাংশ ভারতবাসী চিকিৎসা ও ওষুধ কেনার পেছনে তাঁদের আয়ের সমস্ত অর্থ ঢেলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন, এবং অতি শীঘ্রই চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে আরও ৩.২ শতাংশ ভারতীয় কপর্দকশূন্য হয়ে যাবেন, তাঁদের ঠাঁই হবে দারিদ্রসীমার নিচে। অনেক তথ্য চেপে রেখেও ভারতের পরিকল্পনা কমিশনকে স্বীকার করতে হয়েছে — প্রতি বছর দেশের প্রায় চার কোটি মানুষ চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে যান। পরিকল্পনা কমিশন আরও বলেছে — হাসপাতালে ভর্তি হওয়া গ্রামীণ মানুষের ৪৭ শতাংশ ও শহরের মানুষদের ৩১ শতাংশ — অর্থাৎ হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের শতকরা মোট (৪৭+৩১) ৭৮ জনই চিকিৎসার খরচ চালাতে বিপুল ঋণ করছেন, কিংবা সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে যে, অসুস্থ পরিজনদের চিকিৎসার খরচে জেরবার মানুষ অনেক সময় রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করছেন। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং ইউ পি এ সরকারের অন্তরাত্মা সোনিয়া গান্ধি কি শুনতে পান এই কোটি কোটি মানুষের হাহাকার! ঠাণ্ডা বাড়ি গাড়ি প্লেন ও সংসদভবনের দেওয়াল ভেদ করে এঁদের কান্না কি পৌঁছোয় নেতা-মন্ত্রীদের কাছে!

পরিস্থিতি ভয়াবহ। তাই, মানুষকে স্রেফ ধোঁকা দেওয়ার জন্য সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দফতরকে প্রায় ত্রিশ হাজার কোটি টাকার 'সকলের জন্য বিনামূল্যে ওষুধ' প্রকল্পের প্রস্তাব সংবাদ মাধ্যমকে বলতে হয়েছে। এবার দ্বাদশ পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে জিডিপির ২.৫ শতাংশ বা বছরে ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় করবে বলে সরকার জানিয়েছে। সরকারের বক্তব্য, এর ফলে নাকি গরিব-সাধারণ মানুষ যাঁরা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসেন, তাঁদের উপর থেকে অস্বাভাবিক চাপ কমবে।

আগরতলা, ত্রিপুরা

প্রথমত, স্বাধীন ভারতে এ পর্যন্ত জনকল্যাণের নামে কম প্রকল্প ঘোষিত হয়নি এবং সেগুলির পরিণামও কারও জানতে বাকি নেই। তাছাড়া, গত কয়েক বছরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের যে প্রবণতা, তাতে নতুন এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কেও ঘোরতর সন্দেহ থেকে যায়। দ্বিতীয়ত, বরাদ্দ স্বাস্থ্য বাজেটের ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ অর্থই খরচ করা হয় ডাক্তার-নার্সদের বাসস্থান নির্মাণে ও অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার-নার্সদের পেনশন দেওয়ার কাজে। বাকি যে ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ অবশিষ্ট থাকে তাই দিয়ে কর্মরত ডাক্তার-নার্সদের মাইনে, হাসপাতাল পরিষেবা, ওষুধপত্র, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহ হয়। ফলে, মোট স্বাস্থ্য বাজেট দিয়ে বোঝা যায় না, দেশের সাধারণ মানুষ কতটা স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবে। তৃতীয়ত, সরকারি হাসপাতালগুলির চরম দুর্নীতি, চুরি, হয়রানি, নৈরাজ্য, অব্যবস্থা, দালালরাজ ইত্যাদির কারণে সরকারি প্রকল্পের যৎসামান্য সুযোগগুলি থেকেও বঞ্চিত হয় সাধারণ মানুষ। স্বাভাবিক কারণেই মানুষ ক্ষিপ্ত হয়, সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে গালাগাল করে। আর সেগুলোই ব্যবহার করা হচ্ছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেসরকারিকরণের পক্ষে, বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় রাষ্ট্রীয় ভরতুকি দানের পক্ষে। এবং সরকার ও প্রশাসন সেই সুযোগ করে দিচ্ছে। পুরো স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বেসরকারিকরণের যে লক্ষ্য নিয়ে তারা চলছে, সাধারণ মানুষের মানসিকতাকেও তার পক্ষে লাগাতে চায়।

দেওয়াল লিখন ঃ মেদিনীপুর শহর

ভারতে যে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা রয়েছে, তা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে নিয়ন্ত্রণহীন। জনগণের চিকিৎসা নিয়ে যে যা খুশি করে চলেছে, কার্যত কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, বরং বলা ভাল যে, সরকার এভাবেই চলতে দিচ্ছে। কারণ, এই বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবসা করে মুনাফা লোটার কাজে যুক্ত রয়েছে অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন বহুজাতিক কোম্পানিগুলি, যারা যে কোনও পরিমাণ লগ্নির ক্ষমতা ধরে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে যে কোনও প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষমতা রাখে।

সম্প্রতি '১২তম প্ল্যান ডকুমেন্ট অফ হেল্থ' প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে শক্তিশালী করবে। তার অ্যাপ্রোচ পেপার বা খসড়া পরিকল্পনা সংবলিত পুস্তিকাও তৈরি হয়েছে। এই পেপারে দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের সমস্যাগুলোকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সংক্রামক রোগ, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিষেবা ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সহ সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে পুঁজি বিনিয়োগ এবং ডাক্তার-নার্স নিয়োগ ও তাঁদের প্রশিক্ষণের অভাবকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে শক্তিশালী' করার অর্থ দেবে কে? সরকার দেবে কি? না, সরকার জনগণের টাকায় গড়া কেন্দ্রীয় কোষাগারের অর্থ শিল্পপতি তথা পুঁজির মালিক ও বৃহৎ ব্যবসাদারদের ভরতুকি দেবে, আমেরিকা-ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকে যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধবিমান কিনতে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ ঢালবে, এমপি-এমএলএ-মন্ত্রীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়াবে, কিন্তু দেশের ৯০ শতাংশ জনগণের চিকিৎসার জন্য সরকারের অর্থ নেই। তাই সরকার হাসপাতালে জনগণকে চিকিৎসা দেওয়ার নাম করে 'পিপিপি' বা সরকার ও বেসরকারি মালিকদের অংশীদারী কারবার খুলছে এবং এই কারবারকে গ্রামান্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিচ্ছে। বেসরকারি মালিকরা বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম খুলে যেমন মুনাফা লুটছে, তেমনি সরকারি হাসপাতালে ঢুকেও যাতে মুনাফা করতে পারে — তার ব্যবস্থা করে দেওয়াই আসল মতলব। অ্যাপ্রোচ পেপারে গরিব সাধারণ মানুষের দুর্দশা স্বীকার এই মতলব হাসিলের লক্ষ্যেই। রাজ্যে রাজ্যে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে এবং এই পথে চিকিৎসার পুরো নিয়ন্ত্রণটাই চলে যাবে বেসরকারি ব্যবসাদারদের হাতে, আর হাসপাতালে ঝুলবে সরকারি সাইনবোর্ডটুকুই।

রাজস্থানে দলের ছাত্রকর্মীরা স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন

এলাহাবাদ হাইকোর্টের সামনে আইনজীবীরা ভিড় করে দাবিপত্রে স্বাক্ষর দিচ্ছেন

আসলে, মানুষকে সুচিকিৎসা দেওয়া কারও লক্ষ্য নয়। ক্ষমতার মসনদ, আর পুঁজিপতি, বৃহৎ ব্যবসাদার, বহুজাতিক কোম্পানিগুলির সেবা করে ক্ষমতায় থাকার আশীর্বাদ সংগ্রহ — এই তাদের লক্ষ্য। তাই, আন্দোলনের পথে নামতেই হবে ৯০ শতাংশের অবহেলিত বঞ্চিত ভারতকে। দেশব্যাপী গণস্বাক্ষর সংগ্রহ ও ১৪ মার্চের পার্লামেন্ট অভিযান সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই।

সিকিম ঃ চলছে স্বাক্ষর সংগ্রহ। সংবাদপত্র থেকে।

(তথ্যসূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া ১৩ ফেব্রুয়ারি '১২, ফ্রন্টলাইন ১৮-২১ অক্টোবর '১১)

হাসপাতালে শিশুমৃত্যু রোধ করা সম্ভব

অল্পবয়সেই মা। অপুষ্ট শরীর, তাই শিশুরাও অপুষ্ট হয়ে জন্মায়। ফল — শিশুমৃত্যুর উচ্চহার। রাজ্যে একসাথে অনেকগুলি শিশুমৃত্যুর সাম্প্রতিক ঘটনার কারণ সরকারের তরফ থেকে ব্যাখ্যা হয়েছে এইভাবে। এছাড়াও পরিসংখ্যান দেখানোর ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তাদের ৯ মাসের শাসনে শিশুমৃত্যু ৩ শতাংশ কমেছে বলে সরকার দাবি করেছে।

আর সিপিএম, যারা ৩৪ বছর ধরে ক্ষমতায় ছিল, তাদের সময়েও কেন শিশুমৃত্যু একইভাবে ঘটেছে তার উত্তর না দিয়ে সেই একই পরিসংখ্যানের খেলা খেলেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র। তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, আগে বেশিরভাগ শিশু জন্মাত বাড়িতে। তাঁদের আমলে হাসপাতালে যাতে বেশি শিশু জন্মায় সেই চেষ্টা তাঁরা করেছেন। এখন প্রশ্ন হল, তাতে কি তাঁরা শিশুমৃত্যু আটকাতে পেরেছিলেন? উত্তরটা একই — না।

শিশুমৃত্যু আটকাতে গেলে যা যা ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক তা নিতে কি দুই সরকারই আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়েছে? এই প্রশ্ন রাজ্যের বহু ডাক্তার, রোগী, তাদের পরিবার পরিজন সহ রাজ্যবাসীর। সকলেই উত্তর খুঁজছেন। কোলের সন্তানকে হারিয়ে মায়ের বুকফাটা আর্তনাদ যিনি দেখবেন তিনি উত্তর খুঁজবেন এটাই স্বাভাবিক, এ হল বিবেকবান মানুষের সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয়। অথচ এর মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীসহ অন্য মন্ত্রীরা।

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ বলে দেশের সরকারের প্রচারের শেষ নেই। অথচ শিশুকে বাঁচিয়ে রাখার এবং সুস্থভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব কৌশলে এড়িয়ে যায় সরকার। সরকারি হাসপাতালগুলি চেহারা দেখে। বাইরে থেকেই এ কথা বলে দেওয়া যায়। অনেকে যদিও বিতর্ক তুলতেই পারেন। বলতে পারেন, কেন, সরকার কি কোনও ব্যবস্থাই করেনি শিশু চিকিৎসার জন্য? মহকুমা হাসপাতালগুলিতে শিশু বিশেষজ্ঞ নিয়োগ বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। রাজ্যে আলাদা করে ৩৬০ শয্যার শিশু হাসপাতালও আছে বেশ বড় ধরনের। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ২৭-২৮ জুন বি সি রায় এবং মালদা হাসপাতালে ৪৮ ঘণ্টায় ২১ জন শিশু মারা যায়। তখন মুখ্যমন্ত্রী বি সি রায় শিশু হাসপাতালের পরিকাঠামো বাড়ানোরও অনেক প্রতিশ্রুতি দেন। জেলা হাসপাতালের ক্ষেত্রেও পরিকাঠামো উন্নতির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এখন হাসপাতালে অক্সিজেন থাকে, অসুস্থ শিশুর শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখার জন্য ব্যবস্থাও থাকে। এমনকী যে সমস্ত শিশু বা গর্ভবতী মা হাসপাতালে আসছে না, তাদের জন্য আছেন 'আশা' কর্মীরা। তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নজর রাখছেন, বা তাদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন। এত কিছুর পরেও সরকারের অপদার্থতার প্রশ্ন আসছে কী করে?

আসছে। তার কারণ মানুষ এত পরিসংখ্যান বা সরকারি পরিকল্পনা বা ব্যবস্থার কথা বোঝে না। তারা সাদা চোখে যা দেখে, অভিজ্ঞতার নিরিখে তা বিচার করে নেয়। তাই পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির কথা পূর্বতন সিপিএম সরকার বহু ঢাক পিটিয়েও যেমন মানুষকে বিশ্বাস করাতে পারেনি, তেমনই এই সরকারও পারছে না। কারণ, সরকারি ঘোষণা যা হয় তার রূপায়ণ বেশির ক্ষেত্রেই হয় না। ৩৪ বছরের শাসনে সিপিএম এই রাজ্যে আর কিছু করতে না পারুক সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে ঘুঘুর বাসা বানিয়ে ফেলেছিল। কোথাও কোনও কাজের পরিবেশ রাখেনি। যে বা যারা তাদের খাতায় নাম লেখাবে তাদের সাত খুন মাফ। তাই হাসপাতালে সময় মতো না এসে, বসে থেকে, রোগীর কাছে না গিয়ে, হাসপাতালের জিনিস বাইরে বাজারে বিক্রি করে দিয়ে, রোগী সহায়তা কেন্দ্রের টাকা নয়ছয় করে, সমস্ত অসাধু কার্যকলাপ চালিয়ে কাজের পরিবেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে সিপিএম। এই সরকার এসে এ ব্যবস্থার কি কোনও পরিবর্তন ঘটিয়েছে, নাকি পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা চালিয়েছে? তাহলেই তো মানুষ বুঝতো নতুন সরকার সত্যিই কিছু করতে চায়। আর তাহলে হাসপাতালগুলোতে ঘুঘুর বাসা ভাঙত। চিকিৎসা দেওয়ার মতো মানসিকতা তৈরি হত।

কিন্তু তা হয়নি। হয়নি পরিকাঠামোর উন্নয়নও। বি সি রায় শিশু হাসপাতালে গত বছরের জুন মাসে দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির মধ্যে ৪০ শয্যার অত্যন্ত অসুস্থ শিশুদের নিও নেটাল কেয়ার ইউনিট তৈরি করা ছাড়া আর কোনও পরিকাঠামোগত প্রতিশ্রুতিই রক্ষিত হয়নি। শিশু জন্মের সময় যে সাকশান যন্ত্রটি প্রতিটি শিশুর মুখে ঢুকিয়ে তার লালা পরিস্কার অত্যন্ত জরুরি, সেটা কিনতে খরচ হয় মাত্র ১০ থেকে ১৫ টাকা। তাহলে কেন একই সাকশান নল দিয়ে শিশুদের মুখ পরিস্কার করাতে হচ্ছে? কেন হাসপাতালগুলির শিশুবিভাগে অক্সিজেনের সেন্ট্রাল লাইন করা হয় নি এতদিনেও? তাহলে গ্রুপ ডি'র কর্মীরা কখন অবসর পেয়ে অক্সিজেনের সিলিন্ডার টেনে অসুস্থ শিশুর বেডের সামনে ব্যবস্থা করে দেবে, তার জন্য আর অপেক্ষা করতে হত না। হাসপাতালে নূন্যতম অক্সিজেন মুখোশ, অক্সিজেন হুড, গরম রাখার যন্ত্র, স্যালাইন, গ্লুইড ইত্যাদি কেন উপযুক্ত সংখ্যায় নেই এ প্রশ্নের উত্তর সরকারকে দিতে হবে তো। না হলে শিশুমৃত্যুকে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে রোখা যাবে না।

১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ-এর সেমিনার হলে 'শিশুমৃত্যু ঃ কারণ ও প্রতিকার' শীর্ষক আলোচনাসভা। আয়োজক মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি। বক্তব্য রাখছেন হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত। মঞ্চে উপস্থিত ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ এর অধ্যাপক ডাঃ জয়দেব রায়, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভবানীশংকর দাস, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা।

একটা হাসপাতাল যখন তার পরিকাঠামো না থাকার জন্য শিশুকে চিকিৎসা দিতে পারছে না, তখন ডাক্তারকে অন্য বড় হাসপাতালে রেফার করতে হয়। সেই সময় একজন ট্রেইনড কর্মীর খুব প্রয়োজন, যিনি অ্যাম্বুলেন্সের সাথে যাবেন। শুধু তাই নয়, অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো থাকাও সমান জরুরি। অনেক সময়ই শিশুকে রেফারড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। তাই পরিকাঠামো বলতে শুধু নিও নেটাল কেয়ার ইউনিট খুলে দেওয়া বোঝায় না। যথেষ্ট সংখ্যায় নার্স, গ্রুপ ডি কর্মী হাসপাতালে নিয়োগ করতে হবে সরকারকে। আগের সিপিএম সরকার এই প্রক্রিয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল। গ্রুপ ডি-র ক্ষেত্রে কনট্রাক্ট নিয়োগ চালু করে দিয়ে গেছে তারা। আর কর্মী নিয়োগের নামে এই সরকার এসেই অবসরপ্রাপ্তদের পুনরায় নিয়োগ করছে। সেই ধরনের নিয়োগে কি এই সমস্যার সমাধান হবে। কারণ বয়স্ক নার্সরা ছোটাছুটি করে কাজের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত শিশু বিভাগে নার্স ও শিশুর অনুপাত হল ৫ জন শিশু পিছু ১ জন নার্স। আর খুব অসুস্থ শিশুর ক্ষেত্রে ১ জন শিশু পিছু ১ জন নার্স নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হাসপাতালগুলিতে এত নার্স দেখার সৌভাগ্য আমাদের কোনও দিনই হয়নি।

দ্বিতীয়ত, ব্লক হাসপাতালগুলিতে অসুস্থ শিশুদের শিশুবিভাগ থাকতে হবে। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম রাখতে হবে। সেখানে তা সত্ত্বেও যদি উপযুক্ত চিকিৎসা না করা যায় তাহলে শিশুকে কিছুটা স্থিতিশীল করে মহকুমা স্তরে পাঠানো হয় তা দেখতে হবে। কারণ গ্রামীণ এলাকায় রাস্তা ঘাট অনুন্নত থাকায় মহকুমা বা জেলা হাসপাতালে আনতে আনতেই শিশু মারা যাচ্ছে।

তৃতীয়ত, হাসপাতালে বর্তমানে কোনও প্রয়োজনীয় ওষুধ থাকে না। কেন্দ্রীয় সরকার আইন করে হাসপাতালে ওষুধ কমিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসার এই অতি আবশ্যকীয় ওষুধের ব্যবস্থা না করলে শিশু মৃত্যুকে ঠেকানো অসম্ভব।

চতুর্থত, পরিকাঠামো থাকলেও হবে না। ডাক্তার, নার্স, কর্মচারী, প্রশাসনের সাথে পরিকাঠামোর সমন্বয় সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

তবে সব সরকারই যে কথাটা চাপা দিতে চেষ্টা করে, তাকে মানুষ তার প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে নিচ্ছে। টাকা না থাকলে যে কোলের ছেলেটাকে বাঁচানো যায় না, দু'বেলা ভাল করে না খেলে যে অসুস্থ সন্ধান জন্মায়, তা বুঝতে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাগে? বহু পরিসংখ্যান দিয়ে নেতা মন্ত্রীরা বোঝান এখনও বাড়িতে প্রায় ৫০ শতাংশ শিশু জন্মায়, তারা তো কই বলেন না, কেন জন্মাচ্ছে? বাড়ির কাছে সরকারি হাসপাতালে যদি সবকিছু থাকত, হাসপাতালটাই যদি থাকত, যদি সবই বিনা পয়সায় পাওয়া যেত, যা তার অধিকার। তাহলে তো তারা শখ করে বাড়িতে শিশুর জন্ম দিত না। স্বাস্থ্যখাতে কত টাকা খরচ করে সরকার? ভারতের পুঁজিপতিরা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশের লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা কিনে ফেলছে। ফোবর্স পত্রিকায় পুঁজির পাহাড় জমানোর তালিকায় একেবারে উপরের দিকে নাম তুলছে তারা। আর বিশ্বের অতি দরিদ্র মানুষের এক তৃতীয়াংশ বাস করে এই দেশে। ধনী দরিদ্রের এই বিপুল ফারাক যেখানে, সেখানে ১ বছর বছস হওয়ার আগেই ২০ লক্ষ শিশু মারা যাচ্ছে। ২৩ শতাংশ শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মায়। বিশ্বের মধ্যে ভারতীয় কিশোরীদের ওজন সবচেয়ে কম। গত চার দশকের হিসাব বলছে ভারতে কিশোরীদের গড় ওজন বাড়েনি। অথচ, দেশ বিশ্বের মধ্যে নাকি শক্তিশালী অর্থনীতি নিয়ে অবস্থান করছে! দিন দিন তার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে!

কিছু পরিসংখ্যান দেখিয়ে এই গভীর সমস্যার সমাধান হবে না। এই সমস্যার সমাধান যদি সরকার সত্যিই করতে চায়, তাহলে চাই প্রকৃত জনদরদী দৃষ্টিভঙ্গি। এ রাজ্যের নতুন সরকারের কাজেকর্মে, পরিকল্পনায় সেই দৃষ্টিভঙ্গিই আশা করে মানুষ। তারা চায় সরকারি হাসপাতালগুলিকে যথাযথভাবে পরিচালনা করে, প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের যথাযথ সরবরাহের ব্যবস্থা করে ও ডাক্তার-নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে চিকিৎসার বেহাল দশা দূর করুন।

অভিনন্দন জানাল এ আই ইউ টি ইউ সি

একের পাতার পর

সরকারি কর্মচারীদের একটি বড় অংশ যেভাবে হুমকির কাছে মাথা নত করে ধর্মঘট ভেঙেছেন তিনি তারও নিন্দা করেন। বিভিন্ন জায়গায় এ আই ইউ টি ইউ সি সমর্থক শ্রমিক কর্মচারী ও অন্যান্য ধর্মঘটীদের যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে এবং সংবাদমাধ্যমও আক্রান্ত হয়েছে

কমরেড শঙ্কর সাহা তার প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন ক্ষমতায় থাকার সময় বুর্জোয়া শ্রেণির আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য সিপিএম নেতারা যে ভাবে বনধের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচার চালিয়েছেন আজ তৃণমূল সরকারে বসে একই কাজ করছে। শ্রমিক কর্মচারিদের ধর্মঘটের অধিকারের বিরুদ্ধে যে প্রচার চলছে তা সিপিএম নেতারাই শুরু করে গেছেন। সিপিএম তাদের ভ্রান্ত রাজনীতির জন্য শ্রমিক আন্দোলনকে কেবলমাত্র ভোটের স্বার্থে ব্যবহার করে আখের গোছাতে চেয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনকে উন্নত নৈতিকতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে দাঁড় করানোর চেষ্টাই করেনি। যে কারণে আজ গোটা আন্দোলনকে মূল্য দিতে হচ্ছে। তিনি বলেন, এ আই ইউ টি ইউ সি তার জন্মলগ্ন থেকেই আন্দোলনকে উন্নত নৈতিকতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। তিনি বলেন, আজ বহু জায়গায় সরকারি অফিসে কো-অর্ডিনেশন নেতারা অফিস করলেও একজনও এ আই ইউ টি ইউ সি সদস্যকে হুমকি দিয়ে ভয় পাওয়ানো যায়নি। দমদমের বেদিয়া পাড়ায় পোস্ট অফিস খোলানোর জন্য স্থানীয় তৃণমূল নেতারা পোস্টমাস্টারের বাড়িতে ফোন করে হুমকি দিলেও তিনি ধর্মঘটে অবিচল থাকেন বলে কমরেড সাহা উল্লেখ করেন। কমরেড শংকর সাহা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য মানুষকে আহ্বান জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য।

দাবি আদায় করলেন বিদ্যুৎ গ্রাহকরা

বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার মল্লিকপুর গ্রামের ২৫ কেভি ট্রান্সফর্মার ১৫ ফেব্রুয়ারি ঝড়ে বিকল হয়ে যায়। ১৭ ফেব্রুয়ারি ঐ গ্রামের বিদ্যুৎগ্রাহকরা লিখিতভাবে স্টেশন ম্যানেজারের কাছে আবেদন করেন। মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকা সত্ত্বেও অফিস থেকে সদর্থক সাড়া না পেয়ে এলাকার মানুষ বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির কাছে আসেন। ২১ ফেব্রুয়ারি অ্যাবেকার নেতৃত্বে গ্রাহকরা এস এম-কে ঘেরাও করেন। ঐ দিনই স্টেশন ম্যানেজার ডিভিশনাল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেন এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি ট্রান্সফর্মার বসানো হয়। অ্যাবেকা বর্ধমান জেলা সম্পাদক অখিলেশ্বর পাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। আন্দোলনের এই জয়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা খুবই উৎসাহিত হয়েছেন। তাঁরা বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য সংগঠিত হচ্ছেন।

কেন্দ্রীয় কার্যালয় নির্মাণ তহবিলে সাহায্য করুন

আমাদের প্রিয় দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নিজস্ব কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন ধরেই অনুভূত হচ্ছে। বর্তমানে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় দ্রুত অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন। দলের সকল নেতা-কর্মী-সমর্থক-দরদী ও শুভানুধ্যায়ী জনগণের প্রতি এ জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি।

ড্রাফট বা চেকে অর্থ সাহায্য নিচের নামে দেবেন ঃ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

অভিনন্দন সহ

৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা - ৭০০০১৩ দেবপ্রসাদ সরকার,

(০৩৩)২২৬৫৩২৩৪, ২২৪৯১৮২৮ অফিস সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

১৪ মার্চ পার্লামেন্ট অভিযানের প্রচারে কেরালায় জাঠা ঘুরল ৩ হাজার কিলোমিটার পথ

২৫ ফেব্রুয়ারি ত্রিবান্দ্রমে জনসভায় বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

২৩ জানুয়ারি ত্রিবান্দ্রম থেকে যাত্রা শুরু করে ১৪টি জেলা ঘুরে ২৪ ফেব্রুয়ারি জাঠা ফিরে এল আবার ত্রিবান্দ্রমে। জাঠা কর্মসূচির সমাপ্তি অনুষ্ঠান হিসাবে ২৫ ফেব্রুয়ারি গান্ধী পার্কে অনুষ্ঠিত হল শুধু ত্রিবান্দ্রমের পার্টি কর্মী-সমর্থক-দরদী ও সাধারণ মানুষকে নিয়ে জনসভা। ১৪ মার্চের পার্লামেন্ট অভিযানের বার্তা নিয়ে ৩১ দিন ধরে জনমত সংগঠিত করার কার্যক্রম সফল করার জন্য দলের কেরালা রাজ্য কমিটিকে ও রাজ্যের সকল নেতা-কর্মীদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানালেন সভার মুখ্য বক্তা সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। জাঠা কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, কেরালা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সি কে লুকোস। তিনি ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বিশিষ্ট সদস্য কমরেড ভেনুগোপাল বর্ণনা করলেন এক মাসের তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা। দাবিগুলির প্রতি গরিব ও মেহনতি মানুষের আবেগময় সমর্থন কীভাবে পথের কষ্ট-অসুবিধাকে হাসিমুখে সহ্য করার মনোবল দিয়েছে, ভাড়া করা গাড়ির চালকরাও কেমনভাবে নিজেদের অজ্ঞাতেই জাঠার ভলান্টিয়ার হয়ে গিয়েছেন, এসব কাহিনি শোনালেন তাঁরা। এই জাঠার অন্যতম অঙ্গ ছিল সহজ ভাষায় জনগণের নিত্যকার জ্বালা-যন্ত্রণা-সমস্যা নিয়ে তৈরি পথনাটিকা। বিষয় থেকে অভিনয় ও উপস্থাপনা এতই সুন্দর যে মানুষকে তা চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেছে। এদিনও সভার শুরুতে নাটকটি করলেন কর্মীরা। উল্লেখ্য, ২৫ ফেব্রুয়ারির অভিনয়টি ছিল জাঠা পর্বে ১৮১তম। আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাতে সভায় বক্তব্য রাখলেন কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য ড. এন এ করিম, প্রখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কোশল রামদাস, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ভাস্করন। ২৩ জানুয়ারি জাঠার সূচনা করাতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কর্নাটক রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। কাসারগড়, কন্নুর, ওয়েনাড়, কালিকট, মাল্লাপুরম, পালঘাট, ত্রিচুর, এর্নাকুলাম, ইদুক্কি, কোট্টায়াম, আলেপ্পি, পাথানামথিতা, কোল্লাম ও শেষে ত্রিবান্দ্রম নিয়ে মোট ১৪ জেলার ৩৪০০ কিলোমিটার রাস্তা সফর করেছে এই জাঠা। ২০০টির উপর অভ্যর্থনা সভা হয়েছে। এই সভাগুলির আয়োজন করেছে এবং অভ্যর্থনা দিয়েছে জেলায় জেলায় পার্টির উদ্যোগে গড়ে ওঠা বহুরকম আন্দোলনের গণকমিটিগুলি। স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়েছে ৫০ হাজারের বেশি। কমরেড প্রভাস ঘোষ বললেন, অত্যাচার-শোষণ ও দারিদ্র থেকে, নৈতিক-সাংস্কৃতিক অধঃপতন থেকে জনগণ মুক্তির পথ খুঁজছে। কে তাদের পথ দেখাতে পারে? কংগ্রেস বিজেপি এ দেশের শোষক-শাসক পুঁজিপতিশ্রেণির সেবাদাস বুর্জোয়া দল, এরা সরকারে বসে শোষকশ্রেণির পলিটিক্যাল ম্যানেজারি করে। নানা নামের আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলিরও একই চরিত্র ও কাজ। মার্কসবাদের আলখাল্লা পরে সি পি এম-সি পি আই-ও বুর্জোয়াদের পলিটিক্যাল ম্যানেজারি করার প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে, কোথাও কোনও আন্দোলনে এরা নেই। একটার পর একটা নির্বাচন হচ্ছে, সরকারি মসনদে পলিটিক্যাল ম্যানেজারের বদল হচ্ছে, সাধারণ মানুষের অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে। নির্বাচন দিয়ে অবস্থার বদল হবে না, একমাত্র পথ পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, যে পথের সন্ধান ও রূপরেখা দিয়ে গিয়েছেন মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি, এগিয়ে যাব। এ দেশের ছাত্র-যুবসমাজের প্রতি কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি উদাত্ত আহ্বান পড়ে শোনান কমরেড প্রভাস ঘোষ।

বস্তি উচ্ছেদের প্রতিবাদে ঝাড়খণ্ডে বিক্ষোভ

'উচ্ছেদ নয়, জমির মালিকানাস্বত্ব দাও'— এই দাবিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি রাঁচির ২২টি গ্রাম ও বস্তির হাজার হাজার মানুষ এইচ ই সি-র সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। বস্তি বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতির ডাকে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সমিতির অন্যতম নেতা এস ইউ সি আই (সি) রাঁচি জেলা সম্পাদক কমরেড সিদ্ধেশ্বর সিং, সমিতির নেতা কমরেড কেয়া দে ও সমিতির কোঅর্ডিনেটর বিনয় কুমার।

সাধারণ ধর্মঘট ঃ রাজ্য কমিটির বিবৃতি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ২৭ ফেব্রুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির যুক্ত উদ্যোগে শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবিতে ডাকা সাধারণ ধর্মঘটকে সম্পূর্ণভাবে সফল করার জন্য জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি।

পূর্বতন সিপিএম সরকার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধীদের ডাকা ধর্মঘট ও বনধ ভাঙার পদক্ষেপ নিয়েছিল। বর্তমান তৃণমূল সরকারও সেই একই পথে চলছে এবং সরকারি কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে, এটা উদ্বেগজনক ও অগণতান্ত্রিক।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে উচ্ছেদের চক্রান্ত আসানসোলে পুলিশী বর্বরতার তীব্র নিন্দা করল এস ইউ সি আই (সি)

আসানসোল মহকুমার পুরুষোত্তমপুরে ইসকো সম্প্রসারণের জন্য জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণের সময় বর্বর পুলিশী আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ২৬ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

আসানসোলের ইসকো সম্প্রসারণের জন্য পুরুষোত্তমপুর সহ কয়েকটি গ্রামের ৩০৫ একর জমি জোর করে ২০০৭ সালে অধিগ্রহণের প্রতিবাদে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলনের পর আমরণ অনশনে জেলা শাসক উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ এবং চাকুরির দাবিপূরণের আশ্বাস দেওয়ায় তা প্রত্যাহৃত হয়েছিল। আজ ইসকো কর্তৃপক্ষ জোর করে পুলিশ সহ সেই জমিতে প্রাচীর তুলতে এলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ প্রতিরোধ করে। প্রতিরোধ মোকাবিলা করতে পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চালায় যার ফলে বহু মানুষ আহত হয়েছে এবং ৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। এই নৃশংস আক্রমণের হাত থেকে মহিলা এবং শিশুরাও রেহাই পায়নি। ঘটনায় হতচকিত বিহ্বল আন্দোলনকারী মানুষ আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে।

আমরা এই পুলিশী আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছি এবং দাবি করছি, (১) ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত ও দোষী পুলিশ অফিসার-কর্মীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, (২) ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, (৩) জেলাশাসকের দেওয়া প্রতিশ্রুতিমত ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবার পিছু একজনের চাকরি এবং অধিগৃহীত জমির ন্যায্য মূল্য দেওয়ার পরেই পুনরায় সম্প্রসারণের কাজ শুরু করতে হবে।

জনগণের এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের সমর্থনে পশ্চিমবাংলার সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

পুনরায় ইউনিট প্রতি ৪৪ পয়সা বিদ্যুৎ মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদ

সরকার নিয়ন্ত্রিত রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিতে পুনরায় ইউনিট প্রতি ৪৪ পয়সা মাশুল বৃদ্ধির তীব্র নিন্দা করে অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী ২১ ফেব্রুয়ারি নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন —

মাশুলবৃদ্ধি করা হবে না বলে প্রতিশ্রুত সরকার নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে পুনরায় ফুয়েল সারচার্জের নামে ইউনিট প্রতি ৪৪ পয়সা মাশুলবৃদ্ধি ঘোষণা করেছে। এই নিয়ে গত দেড়মাসে তিনবার ৪৪+৩৮+৪৪=১২৬ পয়সা ইউনিট প্রতি বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে, এর সাথে যুক্ত হচ্ছে ইউনিট প্রতি বকেয়া হিসাবে অতিরিক্ত ৬৬ পয়সা। ফলে ইউনিট প্রতি ১৯২ পয়সা বৃদ্ধি ঘটেছে। এরফলে সরকার নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুতে গড়ে ইউনিট প্রতি ৪২৭+১৯২=৬১৯ পয়সা অন্যদিকে সিইএসসি-তে মাশুল গড়ে ইউনিট প্রতি ৫১৯ পয়সা হয়েছে। এই অস্বাভাবিক মাশুলবৃদ্ধি ভারতবর্ষে কোনও রাজ্যে তথা পশ্চিমবঙ্গে কোনও সরকারের আমলেই ঘটেনি। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি এবং প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

সরকারকে অ্যাবেকার চ্যালেঞ্জ

সরকারের পক্ষ থেকে কয়লার দামবৃদ্ধির যে প্রচার করা হচ্ছে তা আমরা অসত্য বলে মনে করি। আমরা সরকারের কাছে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি যে, সরকার সততার সাথে মাশুলবৃদ্ধির আগে কোন বছর কয়লার দাম কত বেড়েছে এবং তার ফলে বিদ্যুতের কত মাশুল দাঁড়াচ্ছে সেই তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করুক। সরকারের পক্ষ থেকে আর একটা মিথ্যা প্রচার চালান হচ্ছে যে, বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিতে ব্যাপক লোকসান চলছে। দুঃখের কথা হল, এ ব্যাপারে শাসকদলের সাথে সিপিএমও গলা মিলিয়েছে। এ ব্যাপারেও আমরা দায়িত্ব নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি যে, পশ্চিমবাংলার কোনও বিদ্যুৎ কোম্পানি লোকসানে চলছে না। ডব্লুবিএসইডিসিএল-ও একটি লাভজনক সংস্থা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গ্রাহকদের কোনও বিল বাকি না থাকা সত্ত্বেও তাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে জোর করে বকেয়া আদায় করা হচ্ছে। আমরা বকেয়া আদায় বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি।

প্রকৃতপক্ষে এই হিসাব বহির্ভূত মাশুলবৃদ্ধি ঘটানো হচ্ছে কোম্পানিগুলোর প্রবল মুনাফার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, যা পূর্বতন সরকার করে গিয়েছে।

আমরা উন্নয়নের স্লোগানধারী সরকারকে এভাবে উন্নয়ন করা সম্ভব কিনা ভেবে দেখতে বলছি। এই মাশুলবৃদ্ধি পশ্চিমবাংলার অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করবে। সব জিনিসের দামবৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। রাজ্যের ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্রব্যবসা ও কৃষি আরও সংকটগ্রস্ত হবে। কৃষকের আত্মহত্যা মিছিলের রূপ নিতে পারে। খাদ্য উৎপাদন পশ্চিমবাংলায় ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। এই গভীর সংকটজনক পরিস্থিতিতে আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করে মাশুল প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করছি। সাথে সাথে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনসাধারণকে এই অস্বাভাবিক মাশুলবৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য আবেদন করছি।

সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে মেদিনীপুর শহরে সভা

এ আই ইউ টি ইউ সি-এর ডাকে ২৮ ফেব্রুয়ারির সারা ভারত ধর্মঘটের সমর্থনে মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে ২০ ফেব্রুয়ারি একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড রঞ্জিত গুপ্ত। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সিদ্ধার্থ মহাপাত্র, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি। কমরেড মাইতি বলেন, উন্নয়নের নামে বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, কালোবাজারিতে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের নিরাপত্তা চরম বিপর্যয়ের মুখে। এটা হচ্ছে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তিনি এর বিরুদ্ধে সমস্ত স্তরের মানুষকে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন তীব্রতর করে তোলার আহ্বান জানান।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।